(সিকিম পর্ব)

লীলা মজুমদার
সম্পাদিত

মুখার্জি ব্রাদাস
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৮৭

প্রকাশক
সুকুমার মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শিখা চৌধুরী
রূপা প্রেস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মূল্য পাঁচ টাকা

মানুষের জন্ম হোল

সেই কোন আদ্যিকালের কথা।

তখন পৃথিবীতে মানুষ ছিল না। ছিল কেবল আদিগন্ত নীল সমুদ্র, ঢেউয়ে ঢেউয়ে উত্তাল নদী, বিশাল বিশাল পাহাড় পর্বত, আর জমিতে গাছ আর গাছ, লতাপাতার সবুজ। আর ছিল পাখি পাখালির দল, বড় বড় জন্তুরা, কালের অমোঘ নিয়মে যারা এখন একেবারে বিলুপ্ত। এইসব জন্তুদের হুঙ্কার, পাখিদের কাকলি, গাছগাছালির সাঁইসাঁই শব্দ আর সমুদ্র নদীর ঢেউয়ের গর্জন শুনতে শুনতে লেপচাদের দেবতা রম ভীষণ ক্লান্ত বোধ করেন। এরকম ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যে ভরে আছে সমস্ত পৃথিবী, কিন্তু দেখবে কে। একা একা নিজের সৃষ্টির আনন্দ কি ভোগ করা যায়। তাই নতুন জীব সৃষ্টির কথা ভাবলেন দেবতা রম। পশু পাখিদের মত জীব নয়। এমন জীব, যার চেতনা আছে। যে মন দিয়ে উপভোগ করতে পারে সুন্দরকে, জীবনকে। দেবতা রম মানুষ সৃষ্টির কথা ভাবলেন।

এরপর একদিন। দেবতা রম গিয়ে দাঁড়ালেন হিমালয়ের উঁচু চূড়া কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায়। দু'হাতে তুলে নিলেন দুটো বড় বড় বরফের চাঙড়া। তারপর ডান হাতের চাঙড় থেকে তৈরি করলেন এক মানুষের মূর্তি। সে পুরুষ। দেবতা রম তার নাম রাখলেন ফাদং থিং। লেপচা ভাষায় যার মানে মহাবলশালী। আর বাঁ হাতের বরফ থেকে বানালেন নারীমূর্তি। নাম দিলেন নাজংগ্যু অর্থাৎ চিরভাগ্যবতী। এরাই হলেন লেপচা জাতির আদি জনকজননী।

ফাদং থিং আর নাজংগ্যু দুজনে একসঙ্গে বড় হতে থাকে। ডাইনোসেরাস, ব্রণ্টোসোরাস, টেরোড্যাক্‌টিল, মেগালোসেরাস ফেরে

জলে জঙ্গলে। বনান্তরে গাছ আরো বড় হয়, ঝোপঝাড় বাড়তে থাকে। পাহাড় পর্বতের মাথা আরো উঁচু হয়। ফাদং থিং আর নাজংগ্যুর বয়স বাড়ে।

দেবতা রম আপন সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হন। তারই সৃষ্ট এক নারী আর এক পুরুষের চোখে তাঁরই গড়া পৃথিবী এখন নিত্য নতুন রঙে রঙিন হয়। কৈশোর পেরিয়ে ফাদং থিং আর নাজংগ্যু যৌবনে উপনীত হোল। এখন তারা উভয়ে উভয়ের চোখের তারায় আপন আপন মুখশ্রী দেখে। দেবতা রম বিরক্ত হন। এ কেন হোল। তিনি তো এটা চান নি। প্রকৃতির সবুজ আরো সবুজ হয়, কখনো ধূসর, সমুদ্রের জলে কল্লোল তুলে নদী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাহাড়ে পাহাড়ে সূর্যের লাল খেলা করে ফেরে, এ-সব উপভোগের জন্যেই তো তাঁর মানুষ সৃষ্টি। আর এখন তার বদলে কিনা ওরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে মশগুল। দেবতা রম ক্রুদ্ধ হলেন।

তারপর একদিন দুজনকেই দেবতা তুলে নিয়ে এলেন সমতল থেকে। ফাদং থিংকে এনে রাখলেন তাংসেন—নরিমছ্যা পাহাড়ের চূড়ায় আর নাজংগ্যুকে নাগোনা তারাৎ পাহাড়ে। দেবতা রম এবার নিশ্চিন্ত হলেন। এখন তো আর ওরা পরস্পর কাছাকাছি হতে পারবে না। দুজনে দু-পাহাড়ের চূড়ায়। মাঝখানে গভীর খাদ। পরস্পর চিৎকার করলেও একে অপরের কথা শুনতে পাবে না। মাঝখানে ঝোড়ো বাতাসের ভীষণ, ভীষণ আর্তনাদ। আর সে শব্দতরঙ্গ বেয়ে কোনদিন ভেসে আসতে পারবে না কোন গান। দেবতা রম পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে গেলেন।

এদিকে মনের দুঃখে একা নাজংগ্যু গান গায়, কাঁদে। আর অন্য পাহাড়ের চূড়ায় বসে ফাদং থিং একা বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তবু কেউ কারো কাছে যাবার কথা ভাবতে পারে না। মনে পড়ে যায় দেবতা রমের সাবধানবাণী। তাঁর অভিশাপের ভয়। চূড়ায় তুলে

দেবতা রম বলেছিলেন, যদি কেউ কারো কাছে যাবার চেষ্টা করো তবে তোমাদের নির্বাসন দেবো অনেক দুঃখ কষ্টের পৃথিবীতে। আর তা থেকে তোমাদের কোনদিন পরিত্রাণ মিলবে না। তবু ফাদং থিং-এর মন মানে না। তার দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়। নাজংগু্যর চোখের জলে পাহাড় থেকে ঝর্ণা নামে। এমনিভাবে দিন কাটে দুজনের। দিনের পর দিন যায়। নাজংগু্য আর পারে না। সে ভুলে যায় দেবতা রমের অভিশাপের কথা। এখন তার মনে বিদ্রোহ। যা হবার হোক। নাজংগু্য মরিয়া হয়ে ওঠে ফাদং থিংকে দেখবার জন্যে। আর ইচ্ছে থাকলে উপায়ও হয়। সে এখন পথের কথাই ভাবতে থাকে। আর ভাবনাই তাকে একদিন পথ দেখায়। নাজংগু্য নাগোনা-তারাৎ পাহাড় থেকে নামবার সিঁড়ি কাটতে থাকে। বরফ গলার সুযোগে পাথরের খাঁজে খাঁজে সে সিঁড়ির ধাপ বানায়। আর এভাবেই একদিন নাজংগু্য নেমে এলো নাগোনা-তারাৎ পাহাড়ের চূড়া থেকে। আর এভাবেই একদিন সিঁড়ি বানানো শেষ করে সে উঠলো তাংসেন নারিমছ্যা পাহাড়ের শীর্ষে। অনেক অনেকদিন পরে নাজংগু্য দেখলো ফাদং থিংকে। ফাদং থিং কাছে পেল নাজংগু্যকে।

তারপর থেকে প্রতিদিনই চললো উভয়ের গোপন যাতায়াত। কখনো ফাদং থিং আসে। কখনো নাজংগু্য যায়। দেবতা রম পাছে জানতে পারেন, তাই দুজনের যাতায়াত কাল রাতের অন্ধকারে। দিনের আলোয় তারা বসে থাকে পাহাড়ের চূড়ায়, যে যার নির্দিষ্ট আশ্রয়ে। কিন্তু দেবতা রমের তো কিছুই অজানিত থাকবার কথা নয়। একদিন এদের গোপন যাতায়াত তাঁর কাছে ধরা পড়ে। ক্রুদ্ধ দেবতা রম সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ডেকে পাঠালেন। এলো নাজংগু্য আর ফাদং থিং। হাতদুটো সামনে ঝুঁকিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো দুজনে।

দেবতা রম তাদের অভিশাপ দিলেন। তারা অমান্য করেছে তাঁর আদেশ। এ-পাপের ক্ষমা নেই। তারা অপমান করেছে তাঁর সৃষ্টির। এ-পাপের ক্ষমা নেই। পাহাড়ের চূড়া থেকে এখনি তাদের নেমে যেতে হবে নিচে, সমতলে। সেটাই হবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আবাসস্থল। আর সেই সঙ্গে তাদের বইতে হবে পৃথিবীর সমস্ত দুঃখবেদনার ভার। অভিশাপ দিলেন দেবতা রম। তাঁর কণ্ঠস্বরে তখন ছিল বেদনা আর হতাশা! তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য তবে কি বিফল হোল। ফাদং থিং আর নাজংগ্যু তেমনি মাথা নিচু করেই নেমে গেল পাহাড় বেয়ে। সমতলে। ওরা পরস্পরের হাত ধরল।

এখন তারা গাছের বড় বড় ডাল ভেঙে এনে ঘর বানালো। বড় বড় পাতা এনে ঘরের ছাউনি দিল। ফাদং থিং আর নাজংগ্যুর মনে এখন সুখ। সমতলের বনাঞ্চল কখনো চাঁদের আলোয় ভরে যায় কখনো ঘন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে। বিশাল বিশাল মহীরুহ এক ঝড়ের দাপটে উপড়ে যায়। সেখানে গজায় নতুন গাছ। শীতে পাহাড় ঢেকে যায় বরফে। গ্রীষ্মে নেমে আসে জলের ধারা। এমনি করে সময় পেরোয়। মাস। বছর।

ফাদং থিং আর নাজংগ্যুর সুখ আর আনন্দের সংসারে তাদের প্রথম ছেলের জন্ম হোল। সুন্দর সবল ছেলে। কিন্তু ছেলে হলে কি হবে। ফাদং থিং-এর মনের সুখ গেল। দুঃখের মেঘ কালো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মুখে। তার মনে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে থাকলো দেবতা রমের অভিশাপ। মর্ত্যের চরম দুর্ভাগ্য নেমে আসবে তাদের মাথায়। সন্তান-সন্ততি ভোগ করে চলবে পাপের দায়ভাগ। না। না, এ পাপ সে কিছুতেই নিজে ভোগ করবে না। ভোগ করতে দেবে না নিজের সন্তানকে। মনে মনে দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। অবশেষে সে স্থির করে ফেললো নিজের কর্তব্য। না, এ-ছেলেকে

দুর্ভাগ্য বহন করার জন্যে বাঁচিয়ে রাখার কোন অর্থ নেই। ফাদং থিং নিঃশব্দে নাজংগুার কোলের কাছ থেকে ছেলেকে তুলে নিয়ে এলো। ছেলে কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠলো পাহাড় বেয়ে। তারপর পাহাড়ের ওপর থেকে ছেলেকে ফেলে দিল নিচের জঙ্গলের মধ্যে। ঘরে ফিরে নাজংগুাকে বলল সব কথা। নাজংগুা কাঁদলো। কেঁদে নাজংগুার দিন গেল। রাত গেল।
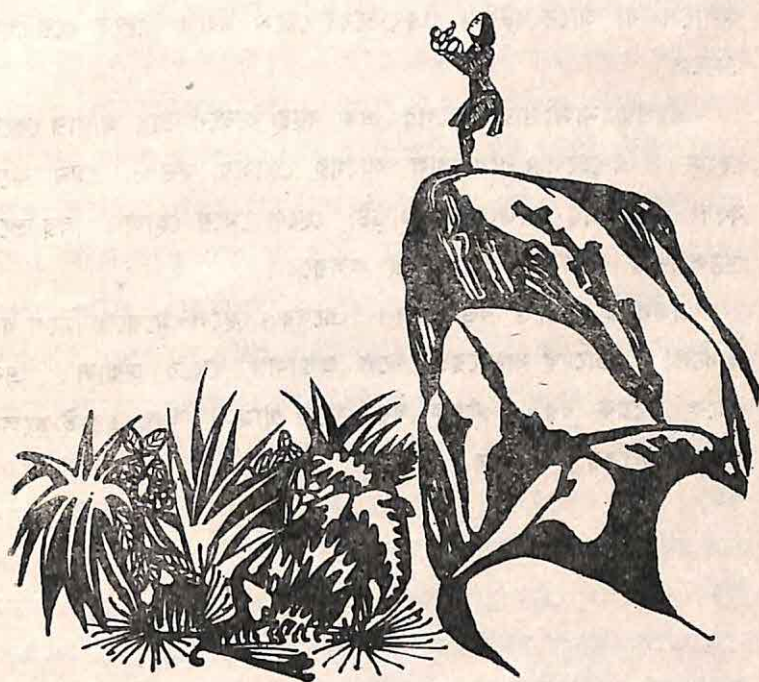
পরের বছর আবার তাদের ছেলে হোল। এবারে আর ফাদং থিং-এর মনে সংশয় ছিল না। ছেলেকে সে আবার ফেলে দিয়ে এলো জঙ্গলে। এমনি করে পর পর সাত সাতটি ছেলে মেয়েকে সে ফেলে দিল।

কিন্তু গোলমাল হোল আটবারের বার। এবারে নাজংগ্যু ক্ষেপে গেল। না, আর নয়। যা হবার হোক। যা ঘটবে, ঘটুক আমার ছেলের কপালে। দেবতা রমের অভিশাপ যেমনভাবে ফলে ফলুক। আমার সন্তানকে আর আমি বিসর্জন দিতে দেবো না। ফাদং থিং কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না নাজংগ্যুর কথা। তার মনে জাগছিল ভয়। দেবতার অভিশাপের ভয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে কিছুতেই ঠেলতে পারলো না নাজংগ্যুর কথা। মেনেই নিল। কপালে যা আছে ঘটুক। এ-ভেবেই মেনে নিল। ছেলে রয়ে গেল কোলে।

এরপর নাজংগ্যুর ছেলের এক বছর বয়েসে তার আবার ছেলে হোল। এ-ছেলেও রয়ে গেল আগের ছেলের মত। এমন করে ফাদং থিং আর নাজংগ্যুর কুড়িটা ছেলে মেয়ে হোল। ঘর ভরে উঠল শিশু-কিশোরের হাসি-কান্না কলরবে।

একসময় এরাও বড় হোল। এদেরও ছেলে-মেয়েতে মিলে ঘর বাঁধলো। তাদের সংসারেও ছেলে জন্মাল। মেয়ে জন্মাল। এক থেকে কয়েক ঘর। কয়েক ঘর থেকে গ্রাম। আর এরাই হলেন লেপচা জাতির পিতৃপুরুষ।

দৈত্যরাজের মৃত্যু

কিন্তু ফাদং থিং-এর ফেলে দেওয়া সেই যে সাত ছেলে, তাদের কি হোল।

একে তো পাহাড়টা বেশি উঁচু ছিল না। তার ওপর নিচেই ছিল বড় বড় নরম ঘাস আর লতাপাতার ঝোপ। তাই কোনো ছেলে-মেয়েই মারা যায় নি। আর মারা যায় নি বলে তারা সাত ভাইবোন একদিন বড় হোল। কিন্তু এরা কেউ মানুষের মতো হোল না। কেউ মানুষের গুণও পেল না। প্রকৃতি আর ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে এরা সবাই হয়ে গিয়েছিল বিরাট বিরাট দৈত্য আর পিশাচ। গায়ে যে কেবল এদের অসীম শক্তি ছিল, তাই নয়, নানা জাদুবিদ্যাও এরা জানত। সেইসঙ্গে ছিল সমতলের মানুষদের ওপর ওদের ভয়ানক রাগ। এই দৈত্যকুলও একদিন বেড়ে উঠল। অগুনতি হোল। ওদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ আর সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলো লাসো-মুঙ-পনু। তাই সেই হোল ওদের রাজা।

লেপচাদের ওপর রাজা লাসো-র রাগ বহুবছর ধরেই জমছিল। তার পিতৃপুরুষকে জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার প্রতিশোধ তার নেওয়া চাই-ই চাই। সে এতকাল ধরে কেবল অপেক্ষা করেছে সময়ের আর সুযোগের। এখন তার জনবল আছে। আছে মন্ত্রবল। তাই একদিন সে সমস্ত লেপচা জাতিকে লড়াইয়ের আহ্বান জানালো। এ-লড়াই হবে দৈত্যদের সঙ্গে মানুষের। হয় পৃথিবীতে লেপচারা থাকবে, না হয় দৈত্যরা। লেপচারা শান্তি সুখে অভ্যস্ত। তারা কখনও যুদ্ধ করেনি। যুদ্ধ চায় না। যুদ্ধ জানে না। তারা ভয় পেল। ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের গুহায়, গর্তে আত্মগোপন করল। কিন্তু তাতেও কি পরিত্রাণ আছে। দৈত্যরা গর্জন করতে

করতে দলে দলে গভীর জঙ্গল থেকে ধেয়ে এলো জনপদের দিকে। লেপচারা দেখল সব যায়। বাড়ি ঘর কিছুই থাকবে না। থাকবে না কোন গৃহপালিত জীব। অবশেষে দৈত্যরা গৃহাভ্যন্তর থেকে খুঁজে বার করে, তাদেরও প্রাণে মারবে।

আর মরতে যখন হবেই তখন লড়াই করে মরাই ভাল। লেপচারা বেরিয়ে এলো গুহার অভ্যন্তর থেকে। বেরিয়ে এলো দলে দলে। যুদ্ধ। তারা যুদ্ধ করবে দৈত্যদের সঙ্গে।

দিনের পর দিন যুদ্ধ চললো। লেপচা বীরেরা প্রাণপণ যুদ্ধ করছিল। তাদের দায় প্রাণ বাঁচানোর। তাই তাদের তীরের আঘাতে অনেক দৈত্য মারা পড়ল। লেপচা বীরেরাও প্রাণ দিল। এতে আরো ক্ষেপে গেল দৈত্যদের রাজা লাসো-মুঙ পনু। কী এত বড় আস্পর্ধা। দৈত্যদের বধ করা। আমার সঙ্গে যুদ্ধ। দাঁড়াও দেখাচ্ছি তবে।

এবার যুদ্ধক্ষেত্রে মায়াবী দৈত্য মন্ত্রের আশ্রয় নিল। লেপচা বীরেরা যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ দেখলো যে তারা যুদ্ধ করছে একপাল ইঁদুরের সঙ্গে। তারপরেই আবার দৃশ্যপট পালটে গেল। তারা দেখলো যে তারা লড়ছে একদল ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের সঙ্গে। আর তার পরেই তাদের দিকে ধেয়ে এলো একদল মানুষখেকো বাঘ। লেপচা বীরেরা এবার ভয় পেল। দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে, কিন্তু মায়াবী চাতুরীর সঙ্গে পারবে কি করে। তাই তারা পালাতে আরম্ভ করলো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে। কিন্তু যাবে কোথায়। ঘরে ফিরলে দৈত্যদের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। অতএব পড়ে রইল ঘর, পড়ে রইল সাজানো সংসার। লেপচারা সপরিবারে পালিয়ে গেল পাহাড়ের জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায়।

এমনি করে বছরের পর বছর গেল। লেপচাদের জীবন কাটতে থাকলো জঙ্গল-গুহার নির্বাসনে। সে-অন্ধকার অবস্থান থেকে সমতলে

আসতে তাদের ভয়। পাছে দৈত্যরা তাদের আক্রমণ করে। হত্যা করে। সে কি দুঃসহ দিন। লেপচারা আর পারে না। এ-দুর্বিষহ দিনের অবসান ঘটাতেই হবে। ঠিক হোল জঙ্গলের এক নির্জন জায়গায় গোপনে তারা সবাই মিলবে। নিজেরা আলোচনা করবে, কেমন করে এই দুঃখময় দিনের অবসান ঘটানো যায়। তারপর এক অন্ধকার রাতে তারা সভায় বসলো। কিন্তু সভায় বসলেই তো আর সমস্যা ঘোচে না। আর তো যুদ্ধ করা যাবে না। কারণ এতদিনে দৈত্যরা যে কেবল সংখ্যায় বেড়েছে তাই নয়। তারা হয়ে উঠেছে আরো নৃশংস, আরো ভয়ঙ্কর। তবে এখন উপায় কি। গ্রাম বৃদ্ধেরা বললেন, আর কোনো উপায় নেই। দেবতা রমকে ডাক। তিনিই আমাদের একমাত্র নির্ভর। সকলে জানু পেতে, চোখ বুজে, করজোড়ে দেবতা রমের উপাসনায় বসলো। হে দেবতা রম, আমাদের কৃপা করো। তুমি ছাড়া আমরা অসহায়। নিদারুণ অসহায়। আজ কতকাল হোল আমরা গৃহহারা। আমাদের সন্তান-সন্ততিরা বনে-জঙ্গলে, গুহায়, পাহাড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। তুমি তাদের রক্ষা করো। হে দেবাদিদেব আমাদের কৃপা করো। দৈত্যের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।

দেবতা রম লেপচাদের প্রার্থনা শুনলেন। সন্তানদের দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। এক গভীর রাতে তিনি দেখা দিলেন গাঁও বুড়োকে। বললেন, তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের রক্ষা করবো। পরদিন সকাল হতে না হতেই, খবর পেয়ে লেপচাদের ঘরে ঘরে সে কি আনন্দ! সকলে বেরিয়ে এলো জঙ্গল ছেড়ে, গুহা ছেড়ে। তারপর নেচে গেয়ে শুরু করলো উৎসব। দেবতা রম মুখ তুলে চেয়েছেন। এবার তাদের দুঃখ ঘুচবে। আবার তারা ঘর পাবে। পাবে মনের মত সংসার।

এদিকে দেবতা রম কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছাকাছি পন্দিন চূড়া থেকে

দুহাত ভরে তুলে নিলেন একরাশ বরফ। আর সেই বরফ দিয়েই গড়লেন এক পরম রূপবান শক্ত সবল মানুষ। তার নাম দিলেন তামজঙ্গ থিং অর্থাৎ মুক্তিদাতা। তারপর তার দেহে প্রাণ দিয়ে, দেবতা রম তাকে বললেন, আমি এ-পর্যন্ত যত জীব সৃষ্টি করেছি, তার মধ্যে তোমাকে দিয়েছি সকলের চেয়ে বেশি শক্তি আর সেই সঙ্গে তোমাকে দিলাম অনেক দৈব ক্ষমতা। এখন তুমি নেমে যাও নিচে সমতলে। আমার সন্তান লেপচারা দৈত্যদের আক্রমণে গৃহহারা। তুমি দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের হত্যা করো। লেপচা জাতিকে সমস্ত বিপদ ও ভয় থেকে বাঁচাও।

তামজঙ্গ থিং দেবতা রমকে প্রণাম করে পাহাড় বেয়ে নামতে থাকলো। তার চলার ভঙ্গিতে দৃপ্ত পৌরুষ, পদভরে যেন কাঁপতে থাকল পায়ের তলার পাথর। সে নেমে এলো সমতলের থার-কোল-থান-ই-থান-এ: লেপচা ভাষার এর মানে হোল, লেপচারা এখানে তাদের স্বাধীনতা লাভ করে। এখানে এসে সে চারিদিকটা দেখে নিল। তারপর আকাশ ফাটিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। সেই প্রচণ্ড হাসি বাতাসে ঝড় তুলে ছড়িয়ে গেল জঙ্গলে-পাহাড়ে সর্বত্র। তার দমকের কম্পনে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটিও। আর সে কাঁপনে ও শব্দে চমকে জেগে উঠল ঘুমন্ত দৈত্য লাসো-মুঙ-পন্নুও।

রাগে গরগর করতে থাকল দৈত্যদের রাজা। এত বড় কার আস্পর্ধা যে এই অসময়ে তার ঘুম ভাঙায়। তখুনি কয়েকজন দৈত্যকে পাঠাল খোঁজ নিতে। যাও, দেখে এসো তো পাহাড়ের ওপরে হাসছে কে। এতবড় সাহস যে, অসময়ে আমার ঘুম ভাঙায়। মন্ত্রী দৈত্যরা ছুটতে ছুটতে গেল পাহাড়ে। সেখানে তামজঙ্গ থিংকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তারা ভয় পেল। ওই বিরাট শরীর। ওই পাথরের মত কালো রঙ। ওই ভয়ঙ্কর হাসি। যেন পাহাড়ের

ওপরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা বিরাট পাহাড়। আর যার মুখ থেকে এখনি বেরিয়ে আসবে একটা লাভাস্রোত। তবু রাজার হুকুম। মন্ত্রীরা কিছু না জেনে ফিরে যেতে সাহস পেল না। দূর থেকে নমস্কার করে, তামজঙ্গকে শুধাল, প্রভু, আমাদের রাজা লাসো-মুঙ-পনু আমাদের পাঠিয়েছেন, আপনি কে তা জানতে। আমরা আপনাকে দেখেই বুঝেছি আপনি মহাশক্তিধর কেউ একজন। এখন যদি দয়া করে আমাদের প্রশ্নের জবাব দেন।

তামজঙ্গ থিং তার বজ্রকঠিন গলায় জবাব দিল। আমি দেবতা রমের স্বৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্বশক্তিমান, এবং সর্বগুণসম্পন্ন। আমাকে দেবতা জন্ম দিয়েছেন তোমাদের রাজাকে বধ করবার জন্যে। আর তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ আমার কি ক্ষমতা। আমার হাসিতে চারিদিকের পাহাড় কাঁপে। আমার পায়ের ভারে টলমল করে পৃথিবী। আমি তলোয়ার তুললে তোমরা সবংশে নিহত হবে। এখনো যদি বাঁচতে চাও তবে তোমাদের রাজাকে গিয়ে বল যে এক্ষুণি যেন তার রাজ্য দেনজং ছেড়ে সকলকে নিয়ে পাতালে চলে যেতে। নতুবা আমার হাত থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। যাও এক্ষুণি গিয়ে তোমাদের রাজাকে বল। তা না হলে আমি তোমাদেরই ভস্ম করে ফেলবো।

দৈত্যমন্ত্রীরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তখনি ফিরে গেল রাজার কাছে। খুলে বলল তামজঙ্গ থিং-এর কথা। শুনে দৈতরাজ লাসো-মুঙ-পনু ভয় তো পেলই না, বরং রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে উঠলো, কি এতবড় আস্পর্ধা আমাকে ভয় দেখানো। এখুনি তৈরি হতে বলো সমস্ত সৈন্যদের। তারপর দেখব সে কত বড় যোদ্ধা।

দৈত্যরাজ সেনাদল নিয়ে লড়তে এল। তাকে কাছে এগুতে দেখেই তামজঙ্গ থিং প্রচণ্ড জোরে হোহো করে হেসে উঠল। আর সে

হাসির দমকে একসঙ্গে কেঁপে উঠল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল। আর তার ফলে দৈত্যসেনাদল ভয়ে আধমরা হয়ে পড়ল। এরপরে আর তারা যুদ্ধ করবে কি। হাত তুলতে চায়, হাত ওঠে না। সামনে এগুতে চায়, পা চলে না। এসব দেখে দৈত্যরাজ লাসো আরও খেপে গেল। যত সব অপদার্থ ভীরুর দল। সরে যা সব আমার সামনে থেকে। আমি একাই যুদ্ধ করব। এই বলে, তলোয়ার উঁচিয়ে দৈতরাজ,
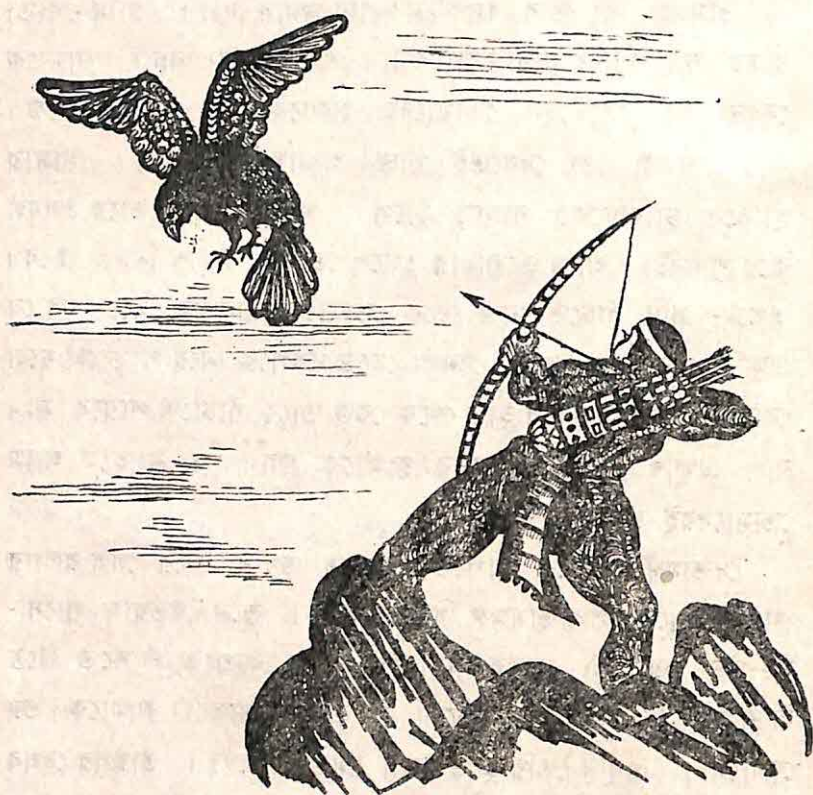
তামজঙ্গ-এর দিকে ধেয়ে গেল। কিন্তু তামজঙ্গ-এর এক তীরে দৈত্য-রাজের হাতের তলোয়ার মাটিতে খসে পড়ল। কিন্তু দৈত্যরাজও কম

যায় না। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মূর্তি ধরে তামজঙ্গ-এর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তামজঙ্গ তৈরি ছিল। হাতের তলোয়ার সোজা চালিয়ে দিল বাঘের গলায়। বাঘবেশী দৈত্যরাজ একলাফে পিছিয়ে এলো। আর পরমুহূর্তেই একটা তেজী পাহাড়ী ঘোড়ার রূপ ধরে তামজঙ্গকে লাথি মেরে ফেলে দেবার জন্যে ছুটে গেল। তামজঙ্গ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে সোজা তলোয়ারের ঘায়ে ঘোড়ার সামনের পা দুটো কেটে ফেলল।

তামজঙ্গ-এর হাতে দৈত্যরাজের এই দুর্গতি দেখে সেনাদল ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আর শুধু যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই পালাল না, পালাল দেশ ছেড়ে। আশ্রয় নিল পাতালে।

এদিকে ঘোড়াবেশী দৈত্যরাজের সামনের পা দুটো কাটা পড়লেও সে থামল না। পেছনের দুপায়ে ভর করেই তেড়ে এলো। তামজঙ্গ খেপে গিয়ে এবার তাকে মেরে ফেলবার জন্য ধনুকে তীর লাগালো। আর এ দেখে দৈত্যরাজ সত্যিই ভয় পেল। এবং তখনি ঈগল পাখির রূপ ধরে আকাশে উড়ে গেল।

লেপচারা এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে তামজঙ্গ-এর যুদ্ধ দেখছিল। এখন দৈত্যরাজ পালাতেই তারা এগিয়ে এলো তামজঙ্গকে অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু তার এখন অভিনন্দন নেবার সময় কোথায়। সে ছুটল ঈগলবেশী দৈত্যরাজের পেছনে। খুঁজে খুঁজে তাকে আবিষ্কার করল মারলী ব্লু পাহাড়ের এক গাছের মাথায়। তামজঙ্গ তাকে লক্ষ্য করে এবার তীর ছুঁড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঈগলবেশী দৈতরাজ অজ্ঞান হয়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু একমুহূর্তে তার জ্ঞান ফিরে আসতেই সে আবার উড়ে গেল আকাশের দিকে।

তামজঙ্গ-এর নেতৃত্বে লেপচারা ছুটল আবার। কিন্তু এত যুদ্ধে অনেক রক্তক্ষরণে দৈত্যরাজ কাহিল হয়ে পড়েছিল। একটু দূরেই একটা গাছের নিচু ডালে তাকে পাওয়া গেল। আর তখনি ছুটে

গেল তামজঙ্গ-এর শেষ তীরটি। দৈত্যরাজের মৃতদেহ এসে পড়ল মাটিতে।

ভয়মুক্ত লেপচারা আবার আনন্দে-সুখে ফিরে এলো আপন দেশে-ঘরে।

আদিপুরুষের দেশে

মায়েল এক স্বপ্নের দেশ।

লেপচা বৃদ্ধেরা পর্যন্ত সে দেশের হদিস জানে না। যুবক এবং কিশোরেরা তো নয়ই। তবু সকলের মনে সে দেশের অস্তিত্ব আছে। আর এভাবেই বংশপরম্পরায় মায়েল দেশ বেঁচে আছে লেপচাদের মনে তার পার্থিব অস্তিত্ব নিয়ে।

লেপচা জাতির বিশ্বাস সেই স্বপ্নের দেশ মায়েলে এখনো বাস করেন তাদের আদি জনক-জননীরা। উত্তরপুরুষদের সঙ্গে এখন আর তাদের যাওয়া আসার কোন সম্পর্ক নেই। তাই কালের গতিতে এখন সে যাতায়াতের পথে গাছ আর পাথর। কোন একদিন সেখানে পথ ছিল। আদিপুরুষেরা আসতেন উত্তরপুরুষদের কাছে। আনন্দের হাট বসে যেত লেপচাদের গ্রাম জুড়ে। তখন, এখনকার মত লেপচাদের মনে ছিল না পাপ আর অন্যায়। পবিত্র পুরুষেরা কোন কলুষই সহ্য করতে পারেন না। তাঁরা যাতায়াত বন্ধ করলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার কোন অভ্যন্তরে সেই পরম স্বর্গ মায়েলে তাঁরা রইলেন শান্তিতে এবং আনন্দে। উত্তরপুরুষদের জন্যে তবু তাঁদের স্নেহ ও ভালবাসা অম্লান। তাই বছরের একটা সময়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে একদল অচেনা অতিথি পাখি উড়ে আসে লেপচা-গ্রাম সিকিমে। আর এই পাখিদের কাকলি প্রতিবছর লেপচা চাষীদের জানিয়ে দেয় এখন থেকে ফসল বোনবার সময় এলো। গাছে গাছে এই পাখিদের কলতানকে তারা মনে করে আদিপুরুষের বার্তা। কখনো কুড়িয়ে যত্ন করে রাখে দু'একটা পালক। ইচ্ছে, সারাবছর তাদের ঘরে আদি জনক-জননীর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

আর এই যে শস্য, এই যে ফসল, তার বীজও তো একদিন সেই

আদিপুরুষেরাই পাঠিয়েছিলেন। কেমন করে পাঠালেন, সে এক কাহিনী।

অনেক অনেক বছর আগের কথা। লেপচাদের এক পূর্বপুরুষ একদিন জঙ্গলে শিকারে বেরিয়েছেন। হাতে পাথরের অস্ত্র। সেদিন কাছাকাছি কোন পশু না পাওয়ায় তিনি চলেছেন আর চলেছেন। চলতে চলতে কখন যে এক গভীর বনে ঢুকে গেছেন খেয়ালই ছিল না। তখন তাঁর ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। জলের সন্ধান করতে থাকলেন। আর এভাবেই চলে গেলেন বনের আর এক অজানা গভীরে। সেখানেই সন্ধান পেলেন পাহাড় থেকে নেমে আসা এক নদীর। অঞ্জলি ভরে জল খেতে গেলেন, হঠাৎ দেখলেন জলে ভেসে আসা একটা গাছের ডাল। তিনি খুবই অবাক হলেন। ও-গাছ তো এ-অঞ্চলে হয় না। তবে কোথা থেকে এলো এই অসাধারণ পাতাওয়ালা গাছের ডাল। তবে কি এ-গাছ মায়েলের! ভাবতেই তাঁর সারা শরীর রোমাঞ্চিত হোল। তবে তো এ-নদী মায়েল থেকেই এসেছে। অতএব তিনি নদীর পাড় ধরে এগোতে আরম্ভ করলেন। যতই এগোন ততই শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আনন্দ আর উদ্বেগে দিন রাতের খেয়াল থাকে না।

একদিন গেল। দুদিন গেল। তিনি হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। তিন দিনের দিন পাহাড়ের এক খাড়াইয়ের সামনে এসে দেখতে পেলেন পড়ে আছে কয়েকটা পাখির পালক। আশ্চর্য, এ-পাখি তো এ-অঞ্চলের পাখি নয়। তাঁর মনে আরো বিস্ময় জাগে। তিনি এখন নিশ্চিত হন, তাঁর পথ ভুল হয়নি। তিনি মায়েলের দিকেই চলেছেন। ক্লান্তি কেটে যায়। আবার উৎসাহ নিয়ে হাঁটতে থাকেন তিনি। তাঁর লক্ষ্য মায়েল।

আবার দিন যায়। রাত যায়। অবশেষে তিনি পৌঁছে যান এক পাহাড় ঘেরা সুন্দর উপত্যকায়। সেখানে চারিদিকে অসংখ্য

সবুজ গাছ। যেন প্রকৃতি দুহাতে ঘিরে আছে সমস্ত উপত্যকাকে। ফুলে ফুলে চারিদিকে নানা রঙের বাহার। তখন দিন প্রায় শেষ।
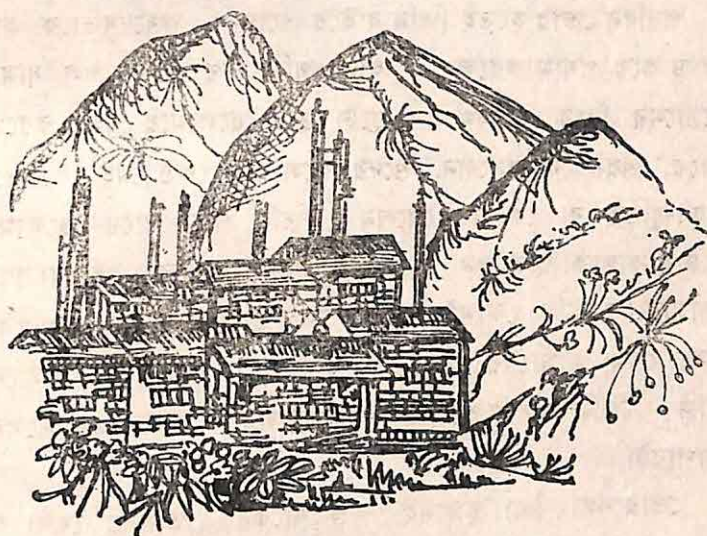
অস্ত্যমান সূর্যের শেষ আভা তখনো লেগে আছে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। উপত্যকায় তিনি দেখলেন পরপর ছবির মত সাতটা বাড়ি। আনন্দে উত্তেজনায় তখন তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছে। তিনি এগিয়ে চললেন একটা ঘর লক্ষ্য করে।

উপত্যকায় সন্ধ্যা নামল। তিনি এসে দাঁড়ালেন একটা ঘরের দাওয়ায়। তখনি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা এবং এক বৃদ্ধ। তাঁকে আদর করে নিয়ে গেলেন নিজেদের ঘরে। আদর আর অভ্যর্থনায় এখন তিনি উদ্বেল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাঁকে কাছে বসিয়ে খাওয়ালেন। তারপর চমৎকার বিছানায় শোবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর চোখে ঘুম আসে না। এই কি তবে সেই মায়েল। আর এরাই কি তাঁর আদি জনক-জননী। শোবার আগে তিনি বৃদ্ধকে

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনাদের কোন ছেলেমেয়ে নেই। বৃদ্ধ হেসে জবাব দিয়েছিলেন, না। এখন ঘুম আসবার আগে তাঁর সে কথাও মনে হোল।

পরদিন ভোর হতেই তিনি বাইরে এলেন। সূর্যদেবতাকে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। আর তখনি চোখ পড়ে গেল সামনে উঠোনের দিকে। দেখলেন দুটো ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে। আরে, ওরা যে বললেন, ওদের ছেলেমেয়ে কেউ নেই। ওদিকে বুড়ো-বুড়িই বা কোথায় গেলেন। তিনি পায়ে পায়ে ছেলেমেয়ে দুটোর কাছাকাছি হলেন। ওদেরই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কারা তোমারদের বাড়ি কোনটা। ছেলেমেয়ে দুটো হাসতে হাসতে জবাব দিল, কেন আমাদের চিনতে পারছো না। এটাই তো আমাদের বাড়ি। তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন! অবশেষে জানলেন। ব্যাপারটা।

ভোরবেলা ওঁরা দুজনেই শিশু থাকেন। তারপর বেলা যত বাড়তে থাকে, ওদের বয়সও বাড়তে থাকে। দুপুর নাগাদ ওরা হয়ে ওঠেন যুবক-যুবতী। তখনই করে নিতে হয় ওঁদের যাবতীয় কাজকর্ম। তারপর বেলা যত পড়তে থাকে ওঁদের বয়সও বাড়তে থাকে। আর সন্ধ্যের মধ্যেই ওরা বুড়ো হয়ে যান। এমনি করে চলে ওঁদের প্রতিদিনের জীবনযাপন।

এখানে মায়েলে সাত ঘরে বাস করেন এমন সাতজন পুরুষ আর সাতজন নারী। লেপচাজাতির আদিপুরুষ।

তিনি পরপর সাতদিন সাতবাড়িতে রইলেন। আদি জনক-জননীদের আদরে যত্নে। তারপর আসবার সময়ে তাদেরই একজন তাঁর হাতে তুলে দিলেন কিছু শস্যের দানা আর বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে চাষবাস করতে হবে। আর বলে দিলেন এখানে যা দেখে গেলে জীবনেও তা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করো না।

তিনি আবার সেই পাহাড়ী পথ ধরে নদীর ধারায় পথ চিনে ফিরে এলেন দেশে। শস্য বোনা হোল। ফসল ফলল। আদি জনক-জননীর আশীর্বাদের কথা কিন্তু গোপন রইল না। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কেউ কোনদিন আর সে পথ খুঁজে পায় নি।

এখনো পাখিরা আসে মায়েল থেকে শস্য বোনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। লেপচা চাষীরা কাঞ্চনজঙ্ঘার অভ্যন্তরে অজানা মায়েলের সাতজন আদি জনক-জননীর উদ্দেশে প্রণাম করে জমিতে বীজ বোনে।

বিবাহের প্রথম উৎসব

মা ইত্‌পনু ছিলেন আদি জননীদের অন্যতম। তার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। যে যার ঘরসংসার নিয়ে দূরে চলে গেছে। কোলের ছেলে তারবংকে নিয়ে এখন তার একা সংসার। মা দুহাতে আঁকড়ে রাখেন ছেলেকে। তারবং-এর বয়স বাড়ে। কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবন। মা ভাবেন কোলের ছেলে ছোটই আছে। তাই কখনো চোখের আড়াল করেন না। সদাই হারাই হারাই ভয়। ছেলেও মা ছাড়া কিছুই জানে না। ঘর আর উঠোন। উঠোন আর ঘর। এর মধ্যেই মায়ের আঁচলে বন্দী থাকে তারবং। এক একদিন আকাশ ভরে যায় কালো মেঘে, পশ্চিমের উঁচু মাথা পাইনের মাথা ঝাঁকিয়ে ঝড় আসে, অথবা বৃষ্টি নামে দক্ষিণের আকাশ থেকে। তারবং তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তার মন চলে যায় ঘর বারান্দা উঠোন ছাড়িয়ে বনের গভীর দিয়ে অনেক অনেক দূরে। ঝড় থেমে গেলে, মেঘ সরে গেলে তার বাইরে যাবার ইচ্ছে আরোও বেশি প্রবল হয়।

তারপর একদিন আর না পেরে মাকে বলেই ফেলে কথাটা। মা আমি বাইরে বেরুব। ঘুরে দেখব চারপাশের জগৎটা। মা ইত্‌পনু ভয় পান। না খোকা যাস না। তুইতো এখনো তেমন বড় হোসনি। যদি হারিয়ে যাস, তবে আমি কেমন করে বাঁচবো বল। তারবং এসব কথাকে আমল দেয় না। বলে, তুমি বড় বেশি ভাব মা। আমি এখন বড় হয়েছি। একথা তুমি কিছুতেই বুঝতে চাও না। মা আর কি করেন। অগত্যা তাকে রাজী হতেই হয়। ঠিক হোল, পরদিন সকালে তারবং বেরুবে বাইরে। এই প্রথম ঘর ছেড়ে, উঠোন ছেড়ে, বন-পাহাড়ের পথে। পরদিন মা ঘুম থেকে

উঠলেন সূর্য ওঠার আগে। ছেলের জন্য ভাত রাঁধলেন। কাপড়ের পুঁটলি করে ছেলের হাতে দিলেন। বেরুবার আগে বললেন, বাবা খিদে পেলেই খেয়ে নিস। আর সন্ধ্যের মধ্যে ঘরে ফিরে আসিস। দেরি যেন কিছুতেই না হয়। ছেলে উঠোন পেরিয়ে বাইরে পা বাড়াল। মা চোখের জল মুছলেন।

তারবং চলছে। বন পেরিয়ে সে পাহাড়ের গাঁ বেয়ে উঠতে থাকল। উঠতে উঠতে অনেক উঁচুতে সে দেখল একটা গাছ ভরে আছে লাল টুকটুকে অজস্র ফলে। পাখির ঝাঁক সেগুলো মনের আনন্দে খাচ্ছে। দু-একটা আধ খাওয়া ফল পড়ছে মাটিতে। অবাক হয়ে দেখল তারবং এই দৃশ্য। আর তখনি তার খিদে পেল। সেই গাছতলাতেই বসে সে খেয়ে নিল মায়ের দেওয়া খাবারটা। তারপর সূর্য পাহাড়ের পেছনে হারিয়ে যাবার আগেই সে ঘরে ফিরল।

মা হাতে স্বর্গ পেলেন। রোজকার মতই কোলে বসিয়ে দুধ খেতে দিলেন। তারপর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করলেন সেদিন সে কি দেখল। কেমন করে কোন দিকে গেল। ছেলে বলে চলল সেদিনের কথা। বড় বড় পাইন গাছের বন, পাহাড়, ফলভর্তি গাছ, আর এক ঝাঁক পাখির কথা। মা বললেন, তবে তো এক কাজ করলেই হয়। কঞ্চি আর সুতো দিয়ে খাঁচা বানিয়ে যদি ওই গাছটায় রেখে আসতে পার তবে অনেক পাখি ধরা পড়বে। আমরাও মনের সুখে মাংস খেতে পারব।

ছেলের মনে ধরল মায়ের কথা। পরের সকাল থেকে সারাদিন বসে বসে তারবং খাঁচা বানাল। তারপর আবার সেই পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে খাঁচা পেতে রেখে এলো গাছের মাথায়। পরদিন সে যখন খাঁচা নামাল তখন তাতে অনেক পাখি। খুশিতে উজ্জ্বল তারবং ঘরে ফিরল। মায়ের হাতে পাখিগুলো দিয়ে সে বলল, এগুলো যদি খাওয়া যায় তবে রেখে দাও। আর যদি না খাওয়া

যায় তবে উড়িয়ে দাও। কিন্তু এ-পাখিগুলো যদি তুমি রাখ, তবে জেন এতেই তোমার খাওয়ানো দুধের দাম শোধ হোল। মা আবার পাখিগুলো দেখলেন। বললেন, বেশ, আমি পাখিগুলো রাখলাম আর তোমার দুধের দামও শোধ হোল।

তারবং আবার খাঁচা নিয়ে বেরিয়ে গেল। আবার পাতবে সেই গাছের কোন ডালে। আবার ধরা পড়বে ঝাঁক ঝাঁক পাখির কয়েকটা। কিন্তু কে জানত যে পাখি ধরার খাঁচাটা সেদিন পাতা হবে না। পাখিরা আগের দিনের মত আজো ফল খেতে এসেছিল। তাদের কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছিল অনেক দূর থেকে। তারবং চলেছিল। কিন্তু পাহাড়ে ওঠার পথেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একটি সুন্দরী মেয়ের। নাম নরীপ্‌নম্। মেয়েটিকে দেখে খুবই খুশি হোল তারবং। বলল, চলো আমার সঙ্গে। আমার বাড়িতে। আমরা একসঙ্গে থাকবো। তোমাকে দেখলে আমার মাও খুব খুশি হবেন। নরীপ্‌নম্ কিন্তু রাজী হোল না। অনেক সাধ্য সাধনা করল তারবং। তবুও না। অবশেষে রেগে গিয়ে সে জোর করে টেনে হিঁচড়ে আনতে চেষ্টা করল নরীপ্‌নম্‌কে। কিন্তু তাতেও সে পেরে উঠল না। মেয়েটি ঝটকা মেরে তাকে ফেলে দিয়ে চলে গেল পাহাড়ের ওধারে। সূর্যাস্তের দিকে। মনের দুঃখে খাঁচাটা পাহাড়ের ওপর ফেলে দিয়ে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। এখন তার মনে বড় বেদনা।

ঘরে ফিরতেই মা ছেলের কান্না-ভেজা চোখ দেখলেন। আদর করে কোলে বসিয়ে তারবং-এর দুঃখের কারণ শুধোলেন। ছেলে একে একে তাকে খুলে বলল সেদিনের সব কথা। বলল, নরীপ্‌নম্‌কে ছাড়া সে বাঁচবে না। মা ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, দুঃখে ভেঙে পড়ার কোন কারণ নেই। তোমার দাদা কোম্‌সি থিং থাকেন পথমে। সেখানে যাও। তাকে খুলে বল সব কথা। তিনিই সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন।

মার কথামতো তারবং গেল পথমে। দাদার সঙ্গে দেখা করে তাকে বলল নরীপ্‌নমের কথা। দাদা বললেন, বেশ তো। তাকে তুমি পাবে। কিন্তু তার জন্যে তোমাকেও তো কষ্ট করতে হবে অনেক। সে কি তুমি পারবে। তারবং এখন নরীপ্‌নম্‌কে পাবার জন্যে যে কোন কষ্টে রাজী। বলল, বল কি করতে হবে। দাদা বললেন চি আর মাখন উৎসর্গ করতে হবে যজ্ঞে। পারবে কি।

তারবং তখন মরিয়া। দাদা যাই বলুক, সে তাই করবে। নরীপ্‌নম্‌কে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। পারবে না। সে রাজী হয়ে গেল সানন্দে। হ্যাঁ দাদা, তুমি যা বলবে, তাই করবো। কোম্‌সি থিং বললেন, তবে এক কাজ করো। সোজা চলে যাও নেপালে। সেখান থেকে আনতে হবে শুয়োরছানা আর পিতলের বাসন। তারবং তখনি বেরিয়ে পড়ল। দিনের পর দিন, রাতের পর হেঁটে পৌঁছল গিয়ে নেপালে। তারপর দাদার কথামত জিনিসগুলো সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল পথমে। কোম্‌সি থিং এবার তাকে পাঠাল নেপালে কামো কাপড় আনতে। তারবং ছুটল নেপালে সেখান থেকে ফিরে আসতেই তাকে যেতে হোল তিব্বতে ন্যুম্বো কম্বল আনতে। এমনি করে সে গেল মায়েল উপত্যকায় ভুট্টা আনতে। আর বলদ আনতে গেল কামং উপত্যকায়।

এভাবে সব জিনিসপত্র যোগাড় তো হোল, কিন্তু এখন এই ভুট্টা সেদ্ধই বা হবে কি করে আর পানীয় চিই বা তৈরি করবে কি করে। অতএব আগুন চাই। আর আগুন পাওয়াই হোল সব চেয়ে বড় সমস্যা। কারণ আগুন আছে একমাত্র দৈত্যদের কাছে। আর তারা থাকে পৃথিবী আর স্বর্গের মাঝখানে। সেখানে কে যাবে। আর যাবেই বা কি করে। আর যাওয়াও যদিবা যায় দৈত্যদের কামার দিয়েত মুং-এর কাছ থেকে আগুন চুরি করে আনা তো

একেবারে অসম্ভব। সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসল। এখন তবে কি করা। তারবং কাঁদতে থাকল অঝোরে।

সে বেদনার কান্নায় বনের পশু পাখিরাও বেদনার্ত হোল। চারিদিকের থমথমে আবহাওয়ায় শোক। অবশেষে সব শুনে এক বনটিয়া নেমে এল গাছ থেকে। সে বলল, আমি এনে দেব দৈত্যপুরী থেকে আগুন। তারবং আশায় কান্না থামাল। বাড়ির সকলে বনটিয়ার নামে মানত করল। আর বনটিয়া উড়ল দৈত্যপুরীর উদ্দেশে। সেই আনবে আগুন।

বনটিয়া উড়ছে তো উড়ছে। অবশেষে যখন পৌঁছল দৈত্যপুরীর দিয়েত মুং-এর বাড়িতে, তখন সে কোথায় বেরিয়েছে। ভাগ্য ভাল
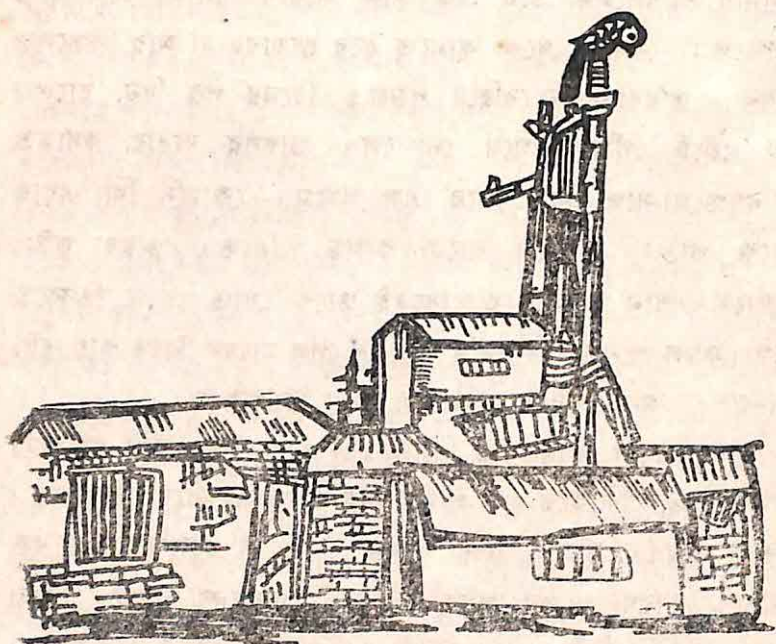
বনটিয়ার। সে আগুন চুরি করে ঠোঁটে নিয়ে আবার উড়ল পৃথিবীর দিকে। সে নিচের দিকে নামছে। নামতে নামতে যখন পৃথিবীর

কাছে, তখনই তার চোখে পড়ল লাল ফলে ভরা একটা গাছ। আর অমনিই তার খিদে পেয়ে গেল। গাছের ওপর আগুন রেখে সে যখন ফল খেতে আরম্ভ করল, তখনি গাছটায় লাগল আগুন। আর সে আগুন হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত বনাঞ্চলে। পুড়ে ছারখার হোল দিগন্তব্যাপী বন। এবং সে আগুনেই পুড়ে মরল বনটিয়া নিজে।

খবর পেয়ে একেবারেই ভেঙে পড়ল তারবং তার সমস্ত আশা ভরসা এবার শেষ। এবার পাখিদের কাছে গিয়ে নিজেই ধর্না দিল সে। কিন্তু আগুন বয়ে আনতে তাদের কারোই সাহসে কুলোল না। সবাই পিছিয়ে গেল। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে এল এক উইপোকার কাছে। তার পাখা আছে। উড়তে পারবে। তাছাড়া এই উইটি নিজে জাদুও জানত। তাকে অনুনয় বিনয় করতে সে রাজী হয়ে আকাশে পাখা মেলল। সে পৃথিবীতে আগুন আনবে। উড়তে উড়তে সে গিয়ে পৌঁছল দিয়েত মুং-এর বাড়িতে। কিন্তু সে ঢুকবার আগেই জাদুর কৌশলে বাড়িটাকে উল্টে দিল। কামার দৈত্য তখন বাড়ি ছিল না। ফিরে এসে বাড়ি দেখে সে সোজা এসে পাকড়ালো উইপোকাটাকে। বলল, তোর এত বড় আস্পর্ধা যে আমার বাড়ি উলটে দিস। তোকে এক্ষুনি টিপে মেরে ফেলব। উই বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। বলল, বেশ তো, মেরে ফেল। কিন্তু ঘর তাহলে আর কোনদিনই তোমার সোজা হবে না।

দৈত্য চিন্তায় পড়ল। তাইতো, ঘর সোজা হবে না, সে কি কথা। না বাবা, ওকে মেরে কাজ নেই। দৈত্যের গজরানি থেমে গেল। বলল, ঠিক আছে, তুমি আমার ঘর সোজা করে দাও। তোমার যা চাই, আমি দেব। এরপর দৈত্যের ঘর সোজা হোল। আর উইপোকা দৈত্যের কাছ থেকে কেবল আগুনই পেল না, সেইসঙ্গে জেনে এলো কেমন করে চকমকি পাথর ঘষে আগুন

জ্বালাতে হয় আর শোলাতে তাকে রাখতে হয়। উইপোকা আবার আকাশে উড়ল। পৃথিবীতে সে আগুন নিয়ে যাবে। কিন্তু এবারও পথের মধ্যে এক ঝড়ের মুখে পড়ে সে আগুন হারিয়ে ফেলল। কিন্তু ভাগ্যিস সে আগুন তৈরি করতে শিখে এসেছিল। পৃথিবীতে ফিরে তাই সে আগুন জ্বালানো শেখাল।

আগুন জেলে যজ্ঞের ভুট্টা রান্না হোল তামার পাত্রে করে। কিন্তু পানীয় চি তৈরির সময়ে আবার সবাই বিপদে পড়ল। পানীয় তৈরি করতে গুড়ের ম্যাতা লাগবে। সেটা কোথায় পাওয়া যাবে। অনেক খোঁজখবর করে জানা গেল সেটা আছে এক বুড়ির কাছে। আর সে-বুড়ি এতই গোপনে লুকিয়ে রাখে সে-ম্যাতা যে তা 'বের করা খুবই শক্ত। কোম্‌সি থিং 'ভাবনায় পড়লেন। এত করে, শেষ পর্যন্ত ম্যাতার জন্যে সব ভেস্তে যাবে। তারবং আবার গেল পশু পাখিদের কাছে। ওগো তোমরা দয়া করো। আমাকে বাঁচাও। আমার এত চেষ্টা সবই কি বিফল হবে।

তারবং-এর কান্নায় পশু পাখিদের চোখেও জল। অবশেষে তাকদের নামের এক পোকা বলল, ঠিক আছে আমিই বুড়ির কাছ থেকে ম্যাতা এনে দেব। তারবং আবার আলো দেখতে পেল। তাকদের রওনা হোল বুড়ির বাড়ির দিকে। বুড়ির বাড়ি অনেক দূর। তাকদের বুড়ির বাড়ি পৌঁছল। তাকদেরের স্বভাব ছিল বড় মিষ্টি। সে বুড়িকে ঠাকুমা বলে ডাকতেই বুড়ি মনের আনন্দে তাকে নিজের নাতির মতই আদর যত্নে ঘরে জায়গা দিল। তাকদের বুড়ির বাড়ি নাতির আদরে থাকে। দিন যায়। তাকদের ভাবে কবে বুড়ি চি বানাবে আর সে জানতে পারবে কোথায় বুড়ি ম্যাতা রাখে। তারপর একদিন বুড়ি চি বানাবে। আর বানাবার আগে তাকদেরকে একটা ঝুড়ির মধ্যে আটকে, তাতে কাপড় ঢাকা দিল। পাছে তাকদের দেখতে পায় বুড়ি কোথায় ম্যাতা রাখে। তাকদেরও

তেমন শেয়ানা। সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে ওঠে, একি করলে ঠাকুমা, তুমি কি করছ তা যে আমি সবই দেখতে পাচ্ছি। বোকা বুড়ি সে মিথ্যে কথাকে সত্যি ভেবে তাকদেরকে তুলে নিয়ে এল ঝুড়ি থেকে। তারপর তাকে এমন ঝুড়িতে রাখল যে সে সত্যি সত্যি সব দেখতে পেল।

বুড়ি ম্যাতার পাত্রটা দড়ি দিয়ে বেঁধে গলার পেছনে ঝুলিয়ে রাখে। তাকদের দেখল। তারপর কদিন ধরে সেটা চুরি করে পালাবার খুবই চেষ্টা করল সে। কিন্তু বুড়ি বড় হুঁশিয়ার। কিছুতেই সে পাত্র চুরি করতে পারল না তাকদের। একদিন গেল। দুদিন যায়। তাকদের ভেবেই পায় না কি করে সে ওই পাত্রটা হাতাবে। অবশেষে একদিন বলল, ঠাকুমা তোমার মাথায় কি উকুন হয়েছে। এসো, আমার কাছে বোস তো, আমি বেছে দি। সত্যিই বুড়ির মাথায় ছিল রাশি রাশি উকুন। আর হবে নাই বা কেন। ম্যাতার পাত্র চুরি যাবে বলে সে তো ভাল করে চানই করতো না। ভালো করে চুল আঁচড়াতো না। বুড়ি তাই খুব খুশি হয়ে তাকদের-এর কাছে এসে বসল। আর তাকদের উকুন বাছতে বাছতে ম্যাতার পাত্রটা বুড়ির গলা থেকে খুলে ফেলল। তারপর যে-মুহূর্তে সেটা হাতে পাওয়া, আর অমনি সেটা নিয়ে তাকদের ছুটতে থাকল। ছুট আর ছুট। বুড়ির বয়স হয়েছে। সে তাকদের-এর পেছনে ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অভিশাপ দিতে থাকল। ওই ম্যাতা দিয়ে বানানো চি যে খাবে সেই ভীষণ মাতাল হবে আর মাতাল হয়ে নিজেরা ঝগড়াঝাঁটি করবে। আর এইজন্যেই তো এখনও মদ খেলে লোকে মাতাল হয় আর ঝগড়া-মারামারি করে। কারণ ওই ম্যাতা দিয়েই তো প্রথম সকলে খাবার জন্যে চি বা মদ তৈরি হয়। আর তারপর থেকেই সব ম্যাতাই তো ওই ম্যাতা থেকে এসেছে।

তাকদের ম্যাতা নিয়ে এলে মহাসমারোহে চি তৈরি হোল। কিন্তু সে চি তখন এত কড়া হোল যে, প্রথম যে সাপকে সেটা খাওয়াবার জন্যে রাখা হয়েছিল, সে মুখে দিতেই একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এরপর অনেক নরম করে তৈরি করে তারপর সেটা মানুষের খাওয়ার মতন হোল।

এরপর দেবতাদের যজ্ঞের জন্যে চি তৈরি হোল। মা ইত্‌পন্থ নিয়ে এলেন মাখন। তৈরি হোল যজ্ঞের উপকরণ। দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করা হোল সব কিছু। ক্রোম্‌সি থিং পাঠালেন নরীপ্‌নম্‌কে উপহার। সে উপহার পেয়ে নরীপ্‌নম্‌ খুশি। বিয়েতে তার আর অমত রইল না। আর ওদের বিয়ের উৎসবে আবার তৈরি হোল চি, আর আয়োজন হোল ভূরিভোজের।

তারবং আর নরীপ্‌নমের বিয়ে হোল। আর পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রথম বিবাহোৎসব, সেই প্রথম বিবাহের বাঁশি।

মহাপ্লাবন

সে বড়ো দুর্যোগের কাল। লেপচাদের জীবনের বড়ো দুঃসময়। টেনডং পাহাড় সেদিন মাথা উঁচু রেখে লেপচা জাতিকে বাঁচিয়েছিল। তাই টেনডং পাহাড়কে আজো তারা সকাল সন্ধ্যায় প্রণাম করে। পুজো দেয় দেবতাজ্ঞানে।

অনেক অনেক যুগ আগেকার কথা। লেপচা জাতি নিজেরা নিজেদের নিয়ে ভুলে থাকত। দেবতা রমের উপাসনা দূরে থাক, তার নাম নিতে পর্যন্ত তাদের আর মনে থাকত না। ফলে দেবতা ক্রুদ্ধ হলেন। ভীষণ ক্রুদ্ধ। সমস্ত লেপচা জাতিকে, তাঁর নিজের প্রিয়তম সৃষ্টিকে ধ্বংস করে ফেলবেন এমন মনস্থ করলেন। তাই বৃষ্টির দেবতাকে ডেকে আদেশ দিলেন এমন বর্ষণের যে, যেন লেপচাভূমি জলের তলায় হারিয়ে যায়।

সেইমত একদিন সকালে পাহাড়-বনের সবুজ রুপোলি রঙের গা বেয়ে বৃষ্টি নামল। বেলা যত বাড়ে বৃষ্টিও তত বাড়ে। আর বাড়ে বাতাস। ঝড়ের তাণ্ডবে বৃক্ষরাজি ভেঙে পড়তে থাকে। আকাশ চিরে চিরে বিদ্যুতের হাহাকার। দুপুরের মধ্যেই সব ঘরের দাওয়া আর উঠোন জলে থৈথৈ করতে লাগল। তারপর দাওয়া পেরিয়ে জল ঢুকল ঘরে। ভয়ে ভাবনায় যে যা সঙ্গে পারল নিয়ে, কোন উঁচু জায়গার সন্ধানে এদিক ওদিক ছুটল। উঁচু ঢিপি, গাছ, যে যেখানে পারল আশ্রয় নিল। কিন্তু সেই বা কতক্ষণ। ভোরের মধ্যেই বড় বড় গাছের মাথা ডুবল। কিন্তু বৃষ্টির বিরাম নেই। বিরাম নেই ঝড়ের প্রলয় মাতনের। লেপচারা তখন আর উপায়ান্তর না দেখে হিমালয়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে থাকল। এরপর জল যত বাড়ে, লোকেরাও তত পাহাড়ের ওপরে উঠতে থাকে। কিন্তু

জল বাড়ার বিরাম্ নেই। হিমালয়ের অনেক পাহাড় একে একে ডুবল। তখন পৃথিবীতে শুধু জল আর জল। বড় বড় ঢেউ। উথাল-পাতাল জলস্রোত। ইতিমধ্যেই অনেক মানুষ ভেসে গেছে। অনেক গরু-মোষ-ছাগল। শেষ পর্যন্ত যারা বেঁচে আছে, তারা আশ্রয় নিল জলের ওপর জেগে থাকা শেষ দুটি পাহাড় চূড়া টেনডং আর মতনম্-এর ওপরে। কিন্তু তখনো বৃষ্টি। তখনো ঝড়। জল বাড়ছে।

এই টেনডং আর মতনম্ ছিল ভাই-বোন। আর তাদের ক্ষমতাও ছিল অসীম। তাই এদিকে জল যত বাড়ছে, দুই পাহাড়ও ততই মাথা উঁচু করছে। কিন্তু জল বাড়ছে। এবং বেড়েই চলেছে। টেনডং আর মতনম্ মাথা উঁচু করেই চলেছে। তাদের মাথায় যারা আশ্রয় নিয়েছে, তাদের বাঁচাতে যেন তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু হঠাৎ একসময় একটা আকাশ অন্ধকার করা মেঘ ধেয়ে এল। আর তখনি ঝড়ের হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ধারা চারিদিকটা আরো অন্ধকার করে দিল। বোন মতনম্-এর যেন মনে হোল যে ভাই টেনডং ডুবে যাচ্ছে। ভয়ে-ভাবনায় মতনম্ মাথা নিচু করে দেখতে গেল। আর তখনি আকাশ-উঁচু ঢেউ এসে তাকে ডুবিয়ে দিল। মতনম্ তলিয়ে গেল জলস্রোতের নিচে। এবং সেইসঙ্গে হারিয়ে গেল অনেক অনেক মানুষ আর তাদের সংসার। ঢেউ তবু ধেয়ে আসতে লাগল মাথা আরও উঁচু করে। আরো ভয়ঙ্কর গর্জন করে। এবার তার লক্ষ্য টেনডং পাহাড়ের মাথা। এবং সেখানে আশ্রয় পাওয়া বেশ কিছু মানুষ।

লেপচারা ভয়ে এমনিতেই আধমরা হয়েছিল। এখন কাঁদতে আরম্ভ করল। আর এত দুঃখের মধ্যে এখন তাদের দেবতা রমের কথা মনে পড়ল। সকলে সমস্বরে দেবতার স্তুতি আরম্ভ করল। হে দেবতা রম, আমরা সকলেই অপরাধী। সুখের দিনে কোনদিন

আমরা তোমার উপাসনা করিনি। তুমি যে আছ আর অহোরাত্র আমাদের রক্ষা করছ, একথা আমাদের মনেই পড়েনি। তবু পিতা কখনও সন্তানদের অপরাধ ক্ষমা না করে পারে? আজ আমাদের দয়া কর। বিপদ থেকে ত্রাণ করো। আমাদের প্রাণ রক্ষা করো।

সন্তানদের কাতর প্রার্থনায় অবশেষে দেবতা রম তুষ্ট হলেন। আহা হাজার হলেও তো ওরা আমারই সন্তান। ওদের ওপর কি ক্রোধ প্রকাশ উচিত। দেবতা রম ঝড়-বৃষ্টির দেবতাকে আদেশ করলেন। বৃষ্টির ধারাপাতের বেগ কমতে থাকল। ঝড় গুটিয়ে নিল তার গর্জনের পাখা। ঘন কালো মেঘ এখন ছিঁড়ে ছিঁড়ে হালকা হতে থাকল। কোথাও কোথাও উঁকি দিল নীল আকাশ। দেবতা রম আশীর্বাদের হাত তুললেন।

কোথা থেকে টেনডং পাহাড়ের ওপরে উড়ে এল একটা পায়রা। বসল এসে পাহাড়ের চূড়ায়। ভয়ার্ত মানুষেরা এখন পায়রাটাকে দেখল। সকলে দেবতা রমের নামে জয়ধ্বনি করে উঠল। পায়রা নিয়ে এসেছে দেবতার আশ্বাস। দেবতার আশীর্বাণী। এই পাখিই আমাদের বিপদ থেকে পরিত্রাণ করবে। জল-ভাসানো বাড়িঘর-ক্ষেত-জমিন আবার তারা ফিরে পাবে। সকলে তখন পায়রার উদ্দেশে হাতজোড় করে স্তুতি আরম্ভ করল। হে দেবতা রমের প্রতিনিধি! হে আমাদের পরিত্রাতা! আমাদের এই চরম বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

পায়রাটা পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এল। এসে বসল তাদের সামনে। লেপচাদের রীতি অনুযায়ী, তারা তাকে চি উৎসর্গ করল। পায়রাটা পরম তৃপ্তিতে চি পান করল। আর পান শেষ হতেই তার ভীষণ তেষ্টা পেল। তেষ্টা পেতেই সে একটু নেমে প্লাবনের সমুদ্র থেকে জল পান করতে আরম্ভ করল।

জল খাচ্ছে তো খাচ্ছেই পায়রাটা। দিনের পর দিন গেল। রাতের পর রাত। জল কমছে। গাছ জেগে উঠেছে জলের ওপরে। তারপর দেখা গেল ডুবে যাওয়া বাড়ি ঘর, ক্ষেত এবং নদী।

লেপচাদের দেশ যেমন ছিল, তেমন স্বাভাবিক হয়ে এল। পায়রা জল থেকে ঠোঁট তুলে ডানা মেলল নির্মেঘ আকাশে। সূর্য উঠল পূর্ব দিগন্তে।

গৃহহারা লেপচারা আবার ঘরে ফিরল। আনন্দে। গানে। আবার গৃহপালিত পশুরা মাঠে গেল। চাষের জমিতে ফসল বোনা হোল। গাছের গৈরিক বর্ণে এল সবুজের সমারোহ। পাহাড়ে পাহাড়ে লতার ফুলে দিগন্ত রক্তিম হোল।

কিন্তু লেপচারা কোনদিনই ভোলে নি সেই মহাপ্লাবনের দিনগুলোর কথা। বংশপরম্পরায় তারা পায়রাকে শুভ চিহ্ন বলে পুজো করে। আর বছরের বিশেষ দিনে টেনডং পাহাড়ে যায় পুজো দিতে।

মতনম্-চূড়া এখনো সারা বছর ঢাকা থাকে বরফ আর মেঘে। শোনা যায় ওই পাহাড়ের ওপরে উঠলে এখনও ডুবে যাওয়া আর্ত সেই মানুষগুলোর চিৎকার কানে আসে। সেই মতনম্-এর উদ্দেশেও তারা সেই বিশেষ দিনে চি নিবেদন করে অন্তরের ভালবাসা জানায়।

কাজ পাগলা ছেলের দল

এক যে ছিল গ্রাম।

এক যে ছিল গ্রাম মানে রূপকথার এক যে ছিল রাজা নয়। এ-গ্রাম অন্য অনেক গ্রামের থেকে আলাদা। এ-গ্রামের সব জোয়ান ছেলেরা পাহাড় কেটে খেত বানায়। সব মেয়েরা ঝর্না থেকে জল তুলে খেত উর্বর করে। সুখ আর সমৃদ্ধি উপছে পড়ছে পাহাড়তলির এই গ্রামে। ছেলেমেয়েদের গর্বে বৃদ্ধেরা আনন্দিত, মায়েদের মনে খুশি। এমন গ্রাম সারা দেশে কটাই বা মেলে। এই গ্রাম আর তার ছেলেদের নিয়েই উপকথা।

কিন্তু সারা বছর তো আর ফসল ফলে না। সেই সময়টা বড় কষ্টের। না আছে খেত চষা। না আছে ফসল বোনা। না ফসল কেটে ঘরে তোলা। জোয়ান ছেলেরা তখন তাদের ভরপুর যৌবন নিয়ে কি করে। মেয়েদের তো সারা বছরই কাজ থাকে। জল আনা। ঘরসংসার। তাদের তো কাজ ফুরোয় না কিন্তু জোয়ান ছেলেরা। অনেকদিন ধরে তারা এই অবসরের কালটা কাটিয়েছে উৎসব করে। বাজনায় আর মাতনে-সে কি তাণ্ডব। যৌবন। বড় উদ্দাম যৌবন। কিন্তু এও তো সেই একঘেয়ে ব্যাপার। নাচ-গান হৈ-হল্লা। ভীষণ ভীষণ ক্লান্ত লাগে। না, একটা কিছু করা দরকার। এ-একঘেয়েমি অসহ্য। কিছু একটা করতে হবেই। কাজ চাই। কাজ। যখন খেতে ফসল বোনা নেই যখন খেত থেকে ফসল তোলা নেই, সেই অবসরের সময়কালের জন্যে কাজ চাই। যৌবন উন্মাদ হয়ে উঠল।

যুবকেরা দল বেঁধে বৃদ্ধদের কাছে গেল। পরামর্শ চাইল। কাজ চাইল। কিন্তু জনকেরা সকলেই পরস্পরের মুখ চেয়ে নির্বাক

রইলেন। গোলায় ওরা ফসল ভরেছে। আকাল কোনদিন এ-গ্রামকে স্পর্শ করেনি। অনাহার কাকে বলে এরা জানে না। সবই তো এই জোয়ান ছেলেদের দান। কোন কাজ তো কোনদিন অবহেলা করেনি। সোনার টুকরো ছেলে সব। এখন খুশির তুফান তুলে ছুটে বেড়াবার সময় ওরা কাজ চাইছে। এখন কাজ কোথায়।

নিরুত্তর জনকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছেলেরা নিজেরাই কিছু একটা ঠিক করবে বলে গিয়ে বসল এক বিরাট ঝাঁকড়া মাথা তেঁতুল গাছের তলায়। কেউ বসল গাছে হেলান দিয়ে। কেউ মাটিতে এলিয়ে দিল শরীর। সূর্যকে আড়াল করে তখন পাহাড়ের চূড়া রক্তিম। বাতাসে বনঝাউয়ের গন্ধ। সকলের চোখমুখ কোন একটা কিছুর করার উত্তেজনায় কাঁপছে। কিছু একটা করতে হবেই। একটা অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারে না। সকলে মিলে কেবল হৈ-হট্টগোল বাধিয়ে বসল। অথচ এখন প্রত্যেকেই চায়, কেউ একজন কিছু বলুক। অথচ কেউই কিছু বলতে পারে না। প্রত্যেকেই এখন ভাবতে চায়। প্রত্যেকের মধ্যেই প্রত্যাশা।

অবশেষে একজন বলল, এ ভাবনার কোন শেষ নেই। তার চেয়ে চল আমরা রাজার কাছে যাই। তিনি রাজা। তিনি জানেন আমরা কি চাই। তিনি আমাদের কাজ দেবেন। সকলে চিৎকার করে সম্মতি জানাল। হ্যাঁ, আমরা রাজার কাছে যাব। উল্লাস থামতেই আর একজন বলল, কিন্তু আমাদের ফিরতে হবে ফসল বোনার সময়ের শুরুতেই। সকলে সচেতন হোল। মাথা নাড়িয়ে সমর্থন করল। হ্যাঁ, আমাদের ফিরতে হবে ফসল বোনার সময়ের আগেই।

দিন স্থির হোল যাত্রার। সমস্ত গ্রাম জুড়ে বৃদ্ধদের মনে ভয়। মায়েদের চোখে কান্না। মেয়েদের মনে হতাশা। ওরা গ্রাম ছেড়ে

অভিযানে বেরুচ্ছে। কে জানে কবে ফিরবে। কে জানে সকলেই ফিরবে কি না। দুঃখ এবং বেদনা পরিব্যাপ্ত সমস্ত গ্রাম জুড়ে এখন হাহাকারের আকুতি, না যেও না।

তবু নির্ধারিত দিন এল। পিতারা বেদনাভারাক্রান্ত মুখ লুকিয়ে তাদের সন্তানদের আশীর্বাদ করলেন। মায়েরা ধান-দূর্বা-চন্দনে ছেলেদের কপালে এঁকে দিলেন তিলকের শুভচিহ্ন। মেয়েরা চোখের জল বুকে চেপে দেবতার কাছে ওদের মঙ্গল প্রার্থনা করল। ওরা বৃদ্ধদের প্রণাম করল। এবং বৃদ্ধাদের। মেয়েদের মাথায় রাখল আশীর্বাদের হাত। ওরা যাত্রা শুরু করল। ওদের সামনে এখন পথই সত্য।

ওরা চলেছে তো চলেছে। ওদের লক্ষ্য রাজার বাড়ি। ওরা ক্লান্ত। কিন্তু আনন্দে আর উত্তেজনায় সে-ক্লান্তি ওদের অবসন্নতা আনছে না। তবু একসময় একটা বড় গাছের নিচে এসে, ছায়ায় ওদের শরীর শীতল হোল। এই প্রথম ওরা ভাবল যে এখন ওদের সামান্য বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু তথাপি ওদের চোখে পড়ল গাছ ভর্তি রাশি রাশি পাখি। তাদের কলগুঞ্জনে এখানে এখন শব্দকল্লোল। ওরা ভাবল। ওদের উত্তেজনা, কিছু একটা করার উত্তেজনাই ওদের ভাবাল। হঠাৎ ওদের একজন বলে উঠল, দ্যাখ, পাখিদের কী সুবিধে। ওরা উড়তে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে ওঠে, সত্যি আমরাও যদি উড়তে পারতাম। আর একজন বলে, তাহলে কি ভালোই হোত। ওদিক থেকে অন্যজন বলে ওঠে, তাইতো আমরা উড়তে পারি না কেন। আর তখনি সকলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, আমরা উড়তে পারি না কেন। কেন আমরা উড়তে পারি না। জিজ্ঞাসা রূপান্তরিত হোল চরম উত্তেজনায়।

এই চূড়ান্ত উত্তেজনার মধ্যে একজন বলে উঠল, ব্যাপারটা আসলে মোটেই শক্ত না। সকলের সমস্বর জিজ্ঞাসা, কি রকম কি

রকম। আসলে দরকার খানিকটা সাহসের। ব্যাস। সোজা উঠে যাও কোন বড় গাছের ওপরে। তারপর দুহাত ডানার মত ছড়িয়ে নাড়তে নাড়তে লাফ দাও। দেখবে ঠিক পাখিদের মতই উড়তে পারছ। সকলেই তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। একজন বলে উঠল, বেশ, তবে তাই করা যাক। কথা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। সকলেই সম্মত। তারপর একজন একজন করে সেই বিরাট গাছটায় উঠতে থাকল। একে একে সবাই উঠল। যতটা ওপরে ওঠা যায়। এখন ওরা গাছের তলাটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। তখন, ওদের মধ্যে প্রথম যে এই প্রস্তাবটা দিয়েছিল, সেই বলল, এবার ছাখ, কেমন করে আমি পাখির মত উড়ে যাই। বলেই সে দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়ল আর ডানার মত করে হাত দুটো ঝাপটাতে থাকল। ওর দেখাদেখি একজন। তারপর আর একজন

তারপর আরেকজন। এমনি করে কয়েকজন সেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল। আর তখনি শোনা গেল গাছের তলা থেকে

কয়েকজন মৃত্যুপথযাত্রীর আর্ত চিৎকার। গাছের ওপরে বাকি যারা ছিল, তারা ভয় পেল। একজন বলল, চল এবার গাছ থেকে নামা যাক। অকারণে আত্মহত্যার কোন মানে নেই। ওড়াটা পাখিদেরই কাজ। মানুষের নয়।

সকলে গাছ থেকে নেমে দেখল, যারা লাফিয়েছিল তারা সকলেই মারা গেছে। একজন বলল, আহা, ওরা মারা গেল। অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, তাতে কি হয়েছে। ওরা তো বীর। সাহসের সঙ্গে প্রাণ দিয়েছে। অন্যজন বলল, হ্যাঁ, ওরা শহীদ। ওরা মৃত্যু দিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে গেল যে পাখিরা ছাড়া অন্য কেউ উড়তে পারে না। সকলে সমস্বরে বলে উঠল, ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, ওরা আমাদের জন্যেই মৃত্যু বরণ করেছে। ওরা শহীদ। উত্তেজনা শান্ত হতেই কেউ একজন বলে উঠল, কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার আমাদের কোন সময় নেই। আমাদের এখনো অনেক পথ যেতে হবে। আমরা রাজার কাছে যাব।

ওরা আর পেছন ফিরে তাকাল না। ওরা চলতে থাকল। রাজধানী ওদের লক্ষ্য। ওরা রাজার কাছে যাবে।

অবশেষে ওরা রাজধানীতে পৌঁছল। একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে এই যুবকরা সোজা চলে গেল রাজদরবারে। একেবারে রাজার সামনে। করজোড়ে নিবেদন করল ওদের সমস্ত কথা। রাজা শুনলেন। এবং ওরা বলল, হে রাজন। তুমি মর্তলোকে আমাদের প্রভু। তুমিই একমাত্র দেবতার প্রতিনিধি। এখন তুমিই বল, কি আমাদের করণীয়। আমাদের দিয়ে তোমার কোন কাজ হওয়া সম্ভব। রাজা স্মিত হাসলেন। সত্যিই তো। তোমরা যুবক। তোমাদের কাজের ওপরেই তো দাঁড়িয়ে আছে দেশ। সারা দেশই তো তোমাদের মুখাপেক্ষী। তোমাদের কাজ নেই, একি সম্ভব। তখনি রাজা মন্ত্রীকে আদেশ করলেন। মন্ত্রী অবনত মস্তকে যুবকদের নিয়ে

বেরিয়ে এলেন। তিনি ওদের কাজ দেবেন। কিন্তু তিনিও জানেন না কি কাজ দেবেন। কাজ কোথায়।

ছেলেরা তখন আর কিছুই ভাবছে না। রাজা বলেছেন কাজ আছে। মন্ত্রীরা দেবেন কাজের নির্দেশ। যৌবন। দেশের উদ্দাম কর্মপ্রার্থী যৌবন। মন্ত্রী তখন উদ্‌ভ্রান্ত। কোথায় কাজ। কি কাজ দেবেন। তবু রাজার হুকুম। কাজ দিতেই হবে। মন্ত্রী ওদের নিয়ে গেলেন রাজার বাগানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে না পেয়ে বললেন, তোমরা এখানেই কাজ কর। কিন্তু এখানে রাজার বাগান দেখতে আছে দশজন মালী, বিশজন চাকর। ওরা তবে কি করবে।

তবু ওরা কাজে লেগে গেল। এখানে গাছ বসায়। ওখানে মরা গাছ উপড়ে ফেলে। এখানে জমি চষে। ওখানে বীজ বোনে। এভাবে দিন যায়। কিন্তু অল্পেই ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একাজ তো আমরা দেশে থেকেই করতে পারতাম। তবে এখানে এলাম কেন। একজন বলল, কিন্তু এ যে রাজার বাগান। অন্যজন জবাব দিল, হলই বা। তফাতটা তাতে কি হোল। সকলেই এখন একাজে ক্লান্ত। কেউ আর কোন প্রতিবাদ করল না। ঠিক হোল, সকলেই ফিরে যাবে দেশে।

পরদিন তারা সকলে রাজার কাছে গেল। জানাল তারা এবার দেশে ফিরে যাবে। রাজা জানতেন, আসলে তাদের কোন কাজ নেই এখানে। তাই সানন্দে তাদের যাবার অনুমতি দিলেন। আর যাবার আগে তাদের উপহার দিলেন কিছু নুন, খানিকটা মাখন আর ষাঁড়ের মাথা। রাজার উপহার পুঁটুলি বেঁধে তারা সকলেই রওনা হোল দেশের দিকে। এখন তাদের মনে আবার আনন্দ ফিরে এল। দেশে ফিরবে। ফসল বোনার সময় আগত। তারপর খাওয়া-দাওয়া নাচগান-হুল্লোড়। ওদিকে তাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন জনক-জননীরা। আর মেয়েরা। সকলের কাছে ফিরে যাবার জন্যে

তাদের মন আগ্রহে অধীর। মন ছুটে চলেছে অনেক আগে। তারা চলছে। ছুটছে চলছে।

পথে পড়ল একটা নদী। নদীর ধারে এসেই তারা ক্লান্ত বোধ করল। তৃষ্ণার্ত হোল। সকলে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। একজন প্রস্তাব করল, তাহলে বসেছি যখন এখানেই রান্নাবান্নার আয়োজন করা যাক। তাছাড়া খানিকটা বিশ্রামও নেওয়া দরকার। সকলেই তখন ক্লান্ত। তাই সকলেই সম্মত। এখন রান্নার যোগাড়ে সকলেই লেগে গেল।

কাঠকুটো যোগাড় হোল। আগুন জ্বলল। হাঁড়িও চাপানো হোল। কিন্তু কি রান্না হবে। সকলে ধরেই নিয়েছিল রাজা যা যা দিয়েছেন, তা নিশ্চয়ই খাবার জিনিস। অতএব পোটলা খোলা হোল। প্রথমেই বের হোল নুন। ওরা ভাবল এটা নিশ্চয়ই রান্না করে খাবার কিছু। অতএব তারা নুনটাই জলে ছড়িয়ে দিল। তারপর বের করল মাখন। ওরা ভাবল এটা নিশ্চয়ই আগুনে সেকে খাবার সামগ্রী। তাই ওটাকে তারা চাটুতে করে আগুনে গরম করতে থাকল। তারপরই তারা পেল ষাঁড়ের মাথাটা। সেটাকে সকলের জন্যে টুকরো করতে তারা পাথরের উপরে রেখে অন্য বড় একটা পাথর দিয়ে সেটাকে ঠুকতেই মাথাটা ছিটকে গিয়ে পড়ল নদীর গভীরে। তখন একজন বলে উঠল, যাকগে যাক, একটা গেলে কিছুই এসে যায় না। অন্যগুলো তো আছে। অন্যরাও বলল, ঠিকই তো।

ফিরে এসে অন্য জিনিসগুলো খাবার জন্যে যখন তারা আগুনের ধারে গোল হয়ে বসল, দেখল, নুন জলে গুলে নিঃশেষ আর মাখন গলে কখন উনুনে পুড়ে গেছে।

সকলে অবশেষে ক্লান্তি-অবসন্নতায় পা টানতে টানতে গ্রামে ফিরল। কোন সম্পদ নিয়ে নয়। নয় কোন আনন্দ-সংবাদ নিয়ে। কেবল এক জীবন-অভিজ্ঞতা নিয়ে, যা কোন সহজ মূল্যে কেনা যায় না।

শয়তান আর দুই বন্ধু

ওরা দুজন ছিল বন্ধু। এমন বন্ধুত্ব কেউ কখনো দেখে নি। বিপদে আপদে, সুখে-দুঃখে কেউ কারো সঙ্গ ছাড়া হয়নি। সেই ছেলেবেলা থেকে এ-বন্ধুত্ব। এখন যুবক বয়সেও সে বন্ধুত্ব অটুট। অথচ দুজন দু'গ্রামের বাসিন্দা। একজন থাকে কারলং-এ আর অন্যজন সাবেয়ান-এ। এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামের দূরত্ব অনেক নয়। তবু আসতে-যেতে ভাঙতে হয় অনেক চড়াই-উৎরাই। আর এভাবেই চলে প্রতিদিনের যাওয়া আর আসা। আসা আর যাওয়া।

দুজনে মিলে ব্যবসা করে। একই ব্যবসা। পাখি ধরার ব্যবসা। রোজ তারা যায় সুংঝুম পাহাড়ে। সেখানে গাছে পেতে দিয়ে আসে পাখি ধরার ফাঁদ। পরদিন দুজনে সে ফাঁদ খুলে ধরা-পড়া পাখি নিয়ে আসে। আসবার আগে আবার পেতে আসে ফাঁদ। এমনি করে দিন চলে। সুখের দিন। দুঃখের দিন। প্রত্যেকদিন সকালে কারলং-এর বন্ধুটি আসে সাবেয়ানের বন্ধুর বাড়িতে। সে বয়সে একটু ছোট এবং চেহারায় জোয়ান। তারপর দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে পাখি ধরতে। খাঁচা পাততে। ধরা পাখি দুজনে ভাগ করে নেয়। পরে দু-বন্ধু ফিরে যায়, যে-যার পথে। আপন গ্রামের দিকে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কি হোল, সাবেয়ানের বন্ধুটির মনে ভাবনাটা এল। পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়েই সে বন্ধুকে কথাটা বলে ফেলল। দ্যাখ, কাল থেকে তোর আর এত কষ্ট করে সাবেয়ানে আসবার দরকার নেই। তুই কারলং থেকে সোজা চলে আসিস এখানে গাছের নিচে। আর আমিও সোজা এখানে চলে আসব। তাহলে এই এতটা ওঠানামার কষ্ট আর থাকবে না। তাছাড়া আমরা কাজ

শেষে এখানে বসেও কিছুক্ষণ কাটাতে পারি। বন্ধু রাজী হোল। কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হোল কেন যেন সে ভয় পেয়েছে।

দু'বন্ধুতে যখন এ-আলোচনা করছিল তখন শয়তান পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনল। বন্ধুরা কেউ তাকে দেখতে পেল না। কেউ জানতে পারল না কি ঘটে গেল। আর এদিকে শয়তান মনে মনে ঠিক করে ফেলল যে একলা আসার পথে একে একে দুজনকেই মেরে তাদের রক্ত শুষে খাবে।

পরদিন কথামত সাবেয়ানের বন্ধুটি একাই এল পাহাড়ে। আজ তার আসতে একটু দেরিই হয়েছিল। কিন্তু এসেই সে খুবই অবাক হোল। একি এখনো তার বন্ধুর দেখা নেই। তবে কি সে এখনো আসেনি। না কি এসে চলে গেছে। কিন্তু এলে তো চলে যাবে না। তবে। নানা জিজ্ঞাসা তার মনের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরতে থাকল। অবশেষে ভাবল, যা হোক, এসে তো পড়বেই। আমি বরং কাজটা এগিয়ে রাখি।

এসব ভেবে সে যথারীতি গাছে উঠে পাখির খাঁচা থেকে পাখি বের করে ঝুড়িতে পুরতে থাকল। আর তখনি সে গাছের ওপর থেকে কেউ একজনকে আসতে দেখল। তার মনে হোল, বন্ধুই আসছে। হঠাৎ শুনল গাছের নিচ থেকে তার বন্ধু বলছে, কি হে বড় তাড়াতাড়ি এসে গেছ। ভেবেছিলাম পথেই তোমাকে ধরব। বন্ধুকে এক মুহূর্তের মধ্যে দূর থেকে গাছের নিচে আসতে দেখে আর তারপরেই এই ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরে, তার মনে সন্দেহ হোল। এতো আমার বন্ধুর গলা নয়। কেউ একজন তার গলা নকল করার চেষ্টা করছে। তাহলে এ নিশ্চয়ই শয়তান। সে ভয় পেল। আবার তখনি সেই কণ্ঠস্বর তাকে বলল, তুমি কেমন করে গাছে উঠলে হে। আমাকে ওঠার কায়দাটা বলে দাও। এবার আর তার কোন সংশয় রইল না। ওটা শয়তানই। আর সেইজন্যেই সে গাছে উঠতে পারছে না।

সে জানত শয়তানটা কিছুতেই গাছে উঠতে পারবে না। তবু সে গাছের ওপর বসে ঠকঠক করে কাঁপছিল ভয়ে। আর ঘামছিল। তবু সে ভাল করে দেখবার জন্যে একবার গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নিচে তাকাল। আর দেখতে পেল যে শয়তানটা মাথা নিচের দিকে পা উপরে করে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে গাছে উঠতে যতবারই সে চেষ্টা করছে, ততবারই পড়ে যাচ্ছে।

এখন শয়তানের ওইসব কাণ্ডকারখানা দেখে সে খানিকটা সাহস পেল বটে, কিন্তু ভয় কাটল না সবটা। যদি শয়তানটা কোনরকমে উঠে আসে। যদি সে শয়তানের হাতে মারা পড়ে।

এদিকে ততক্ষণ চেষ্টা করে করে, না পেরে শয়তানটা গাছে ওঠবার আশা পরিত্যাগ করেছে। আর নিচে থেকে তাকে ডাকছে, গাছে বসে থেকে কি করবে। তার চেয়ে এসো নিচে নেমে আমার সঙ্গে শসা খাবে এসো। শয়তানের ডাক শুনে সে নিচে তাকিয়ে দেখল। আর দেখামাত্রই তার মাথা ঘুরতে লাগল। নিচে তখন শয়তান তুলে ধরেছে তার বন্ধুর কাটা মাথা। সেই সদ্যকাটা মাথা থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। আর শয়তান সেই রক্ত চুষে চুষে খাচ্ছে।

ভয়ে আর উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিল। এখন সে কি করবে। এখানে আসার পথে একলা পেয়ে শয়তানটা বন্ধুকে টুঁটি ছিঁড়ে মেরেছে। যদি এখন কোনক্রমে ও আমাকে গাছ থেকে নামাতে পারে তবে আমারও ওই দশাই হবে। এখন কি করা যায়। কি করে আজ এই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাব। সে এখন ভেবে কিছু একটা উপায় বের করতে চায়। কিন্তু করবে কি করে। ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। সারা শরীর ঘামছে। দুহাতে গাছ জড়িয়ে বসে আছে। তবু পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। তবু ভাবতে হবে। তবু।

অবশেষে সে একটা উপায়ের কথা ভাবল। এবং তার মনে হোল

এটাই একমাত্র বাঁচবার উপায়। খাঁচায় ধরা পড়া পাখিগুলো সে তিনটে পুঁটুলিতে বাঁধল। একটা ছোট, পরেরটা মাঝারি এবং তৃতীয়টা বেশ বড়। তারপর দেবতার নাম স্মরণ করে প্রথমে বড় পুঁটুলিটা যতটা সম্ভব গায়ের জোরে দূরে ছুঁড়ে দিল। ধপাস করে একটা শব্দ হতেই শয়তানটা ভাবল এই বুঝি গাছ থেকে নেমে লোকটা পালাল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেও ছুটল শব্দটার পেছনে। কিন্তু ওখানে কোন মানুষকে না পেয়ে শয়তান আবার ফিরে এসে

বসল গাছতলায়। একটু পরেই সে ছুঁড়ল দ্বিতীয় পুঁটুলিটা। আরো জোরে। এবার পুঁটুলিটা আগেরটার চেয়ে হাল্কা থাকায় পড়ল গিয়ে আরো দূরে। আবার শয়তানটা লোক ভেবে ছুটল। তারপর আবার ফিরে এসে বসল গাছতলায়। একটু পরে সে ছুঁড়ল তৃতীয়

পুঁটুলিটা। এটা ছিল সবচেয়ে হাল্কা। এবং সে ছুঁড়েছিলও মরিয়া হয়ে। ফলে সেটা পড়েছিল গিয়ে অনেক দূরে। এবারেও শয়তান আগের বারের মতই ছুটল সেই শব্দের দিকে।

আর এই অবসরে সে গাছ থেকে নেমে ছুটল নিজের বাড়ির দিকে। ছুটছে তো ছুটছেই। সে এক মরণপণ ছোটা। আর এভাবে ছুটেই সে বাড়ির উঠোনে ঢুকল। বাড়ির সকলে ওর চিৎকার আর ছুটে আসবার শব্দে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ততক্ষণে সে নিজের বাড়ির উঠোনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সকলে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। কি হয়েছে। এমন করে ও দৌড়ে এল কেন। কিন্তু তখন আর তার কোন কথা বলার অবস্থা নেই। কেউ একজন জল এনে ওর মুখে দিল। গোঙাতে গোঙাতে কোনমতে সে 'শয়তান' শব্দটা উচ্চারণ করল। তখন সকলে আরও উদ্‌গ্রীব হয়ে পুরো ঘটনা জানাতে চাইল। বল। বল কি হয়েছে। শয়তান কি করেছে। কিন্তু আর কোন জবাব তার কাছ থেকে এল না। লোকটি ততক্ষণে মারা গেছে।

দুই বন্ধুর এই আকস্মিক মৃত্যুতে সকলের চোখেই জল এল। শোকে পাগলের মত হয়ে গেল দুবাড়ির লোকেরা। গ্রামবৃদ্ধরা তখন বলেছিল যে প্রাচীন প্রবাদ আছে, কোন খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরের কোন জায়গায় দেখা করার কথা ঠিক করো না। তাহলে একজনের বেশে শয়তান আসবে। এ-প্রবাদ না মানার ফলেই ছেলেদুটো অকালে চলে গেল।

প্রেতিনী গীন্নু মুঙ

গীন্নু মুঙ-এর ভয়ে কাঁপত না এমন ধনী লোক তখন দেশে একজনও ছিল না। ঘরে টাকাপয়সা আছে। চুপ চুপ গীন্নু মুঙের কানে না যায়। ভাল জামাকাপড় পরে সাজগোজের বাহার দেখাবে। খবরদার, গীন্নু মুঙ দেখে ফেলবে। ভয়ে, ত্রাসে পয়সাওয়ালা লোকদের রাতে ঘুম ছিল না। দিনে শঙ্কার অন্ত থাকত না। লোকেদের ঘরে ঘরে তখন একটি মাত্র কথা। গীন্নু মুঙ, গীন্নু মুঙ। ধনীদের ভয়। ধনীদের ত্রাস।

না। গীন্নু মুঙ চোর না। গীন্নু মুঙ ডাকাত না। গীন্নু মুঙ প্রেতিনী। এক ভয়ঙ্কর হিংসুটে প্রেতিনী। সে গরিবদের কখনো কিছু ক্ষতি করত না। এমনকি ধারে কাছেও ঘেঁষত না। তার যত রাগ ছিল পয়সাওয়ালা লোকেদের ওপর। হঠাৎ একদিন চড়াও হয়ে এর বাড়ির সমস্ত গরু-মোষ মেরে রেখে গেল। আর একদিন ওর বাড়ির সব ধনরত্ন লুটে নিয়ে গিয়ে কোন নদী বা পুকুরে ফেলে দিয়ে গেল। এমনি করে সারা দেশ জুড়ে চলছিল গীন্নু মুঙের অত্যাচার। লোকেরাই বা কি করবে। গীন্নু মুঙ তো আর মানুষ নয়, যে তার অত্যাচার ঠেকাবে। তাই পয়সাওয়ালা লোকেরা কখনো তাদের পয়সার জাঁক করত না। এমন কি দামী জামা কাপড়ও কেউ পারতপক্ষে পরত না। পাছে গীন্নু মুঙ জানতে পারে। পাছে গীন্নু মুঙ-এর অত্যাচার শুরু হয়। তবু গীন্নু মুঙ জানতে পারত। তবু গীন্নু মুঙ মাঝে মাঝেই হানা দিত।

কিন্তু কে এই গীন্নু মুঙ। কি তার পরিচয়। আর কোথা থেকেই বা সে এল। তাহলে বলতে হয় পুরো ঘটনাটা।

একসময় লিঙথেম গ্রামে গীন্নু পরিবারকে কে না জানত।

আজকের এই গীন্নু মুণ্ড সেই পরিবারেরই মেয়ে। এই পরিবারে ছিল সাত ভাই আর এক বোন। এই সাত ভাই আর সাত স্ত্রীর প্রত্যেকেরই ছিল একটা করে ছেলে আর একটা মেয়ে সেই ছেলে-মেয়েদের ছিল প্রত্যেকের বউ আর স্বামী। পৈতৃক বাড়িটা একে ছিল ছোট তার ওপর এতগুলো লোক। তাই সকলকেই প্রায় দমবন্ধ করেই থাকতে হোত। অথচ কিছু করার উপায় নেই। এরা ছিল যেমন গরিব, তেমন আলসে। আর তেমনি হিংসুটে। তাই ধান ওঠার পর খেত কুড়িয়ে জঙ্গল থেকে ফল ফুল পেড়ে ঘাসের দানা সংগ্রহ করে কোনমতে সকলে জীবনধারণ করত। আর যে সামান্য জমি ছিল, তাতে সামান্য ফসল ফলত। আর সেটাই ছিল বাড়তি উৎসব। গরিবের ঘরে বেনারসী শাড়ির চমক। সুখে না হোক, শান্তিতে ছিল তারা। সকলে মিলেজুলে।

কিন্তু এ-শান্তি বেশিদিন সইল না। ভাইদের মাথায় এসে ভর করল শয়তান। তারা তাদের একমাত্র বোনের ঐশ্বর্যের দিকে নজর দিল। আর অমনি হিংসেয় জ্বলতে থাকল তাদের মন।

ওদের বাবা মেয়ের ভাল ঘরে, ভাল বরে বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েটির স্বামী মারা গেছে। বিধবা মেয়েটি এখন তার একমাত্র মেয়ে সন্তান নিয়ে নিজের বাড়িতে বাস করে। ওর মেয়ের বয়স বছর ষোল। ওদের বড় বাড়ি। অনেক গরু-ছাগল-মোষ। অনেক গয়না। অনেক টাকাকড়ি। মা ভেতরের ঘরে থাকে। মেয়ে থাকে অন্য একটা ঘরে। কাজের লোকজন থাকে দূরে গোয়ালের কাছে একটা ঘরে। বাড়-বাড়ন্ত সুখের সংসার।

ভাইদের কুটিল চোখ পড়ল এখন এই সংসারে। ভাইরা ওদের পয়সাকড়ি, গয়নাগাঁটি মনে মনে নিজেদের মধ্যে ভাগ করতে বসল। আর মুখে বলল, আমাদের না আছে টাকাকড়ি, না আছে ঘরদোর, না আছে গরু-মোষ, না আছে জমি-জমা। অথচ ওই তো ওরা দুটো

মানুষ। যেমন বাড়ি, তেমন সোনা-দানা, পয়সাকড়ি। না, না, এসব সহ্য করা যায় না। আমরা অনাহারে মরব, আর ওরা ফেলে ছড়ে থাকবে। ওসব চলবে না। ওরা নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করে ঠিক করে ফেলল কি করে ওগুলো কেড়ে নেবে।

তারপর একদিন রাত্রে। সাতভাই দা-কুড়োল নিয়ে গিয়ে হাজির হোল বোনের বাড়িতে। সেদিন ছিল অমাবস্যা। কেউ কিছু দেখতে পেল না। সাতভাই বোনের ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে খণ্ড খণ্ড করে বোনকে কাটছে, তখনি মায়ের চিৎকারে মেয়ের ঘুম ভাঙল। সে ছুটে এল মায়ের ঘরের দিকে। আর সেইসঙ্গে ছুটে এল বাড়ির মুনিষজনেরা। লোকের চিৎকারে সাতভাই বোনের মৃতদেহ সেখানে ফেলেই পালিয়ে গেল। আর এদিকে মেয়ে মায়ের ঘরে ঢুকল, চারিদিকে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ভয়ে তার সারা শরীর কাঁপতে থাকল। কিন্তু তখনি সে দেখল বিছানায় রক্তের বন্যার মধ্যে মা বসে আছেন তাঁর পুরো শরীর নিয়ে। মেয়ে জানত, মায়ের জাহুর ক্ষমতার কথা। তাই সে খুব অবাক হোল না। আর তখনি মা কথা বলে উঠলেন, তুমি যখন এসে পড়েছ, ভালোই হয়েছে। ছাখ তোমার মামাদের কাণ্ড। পয়সা-কড়ির লোভে তারা আমাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটেছে। এখন তোমাকে কিছু বলব বলেই, কাটা খণ্ডগুলো জুড়ে আমি এখন বসে আছি। আগে একটা কাজ করো। সোজা রাস্তা ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাও। যেতে যেতে দেখবে একটা জায়গায় হুটো রাস্তা একজায়গায় এসে মিলেছে। সেখানেই ডান দিকে দেখবে একটা অদ্ভুত পাতাওয়ালা গাছ। তা থেকে একটা তিন পাতার পল্লব ভাঙবে। তারপর পেছনে না তাকিয়ে সোজা চলে আসবে আমার কাছে।

মেয়ে মায়ের কথামত সোজা ছুটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু জায়গাটা

অনেক দূরে। তাই যখন সে পল্লব নিয়ে ফিরে এল, তখন সকাল হয়ে গেছে। মায়ের হাতে পল্লবটা দিতেই, মা মেয়েকে নিয়ে বাইরে এলেন। তারপর সেই পল্লবে মন্ত্র পড়ে ভীষণ জোরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সোঁ সোঁ শব্দে পল্লবটা উঠে গেল আকাশে। তারপর সূর্যকে ঢেকে দিল। আবার পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে এল। মা বললেন, ছাখ, আমি আমার জাদুক্ষমতায় পৃথিবীটা অন্ধকার করে দিলাম। এখন আমি আমার ইচ্ছেমত যেখানে খুশি যেতে পারব। যা ইচ্ছে তাই করতে পারব। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে কিছু বলে যাবার আছে। এসো ঘরে এসো।
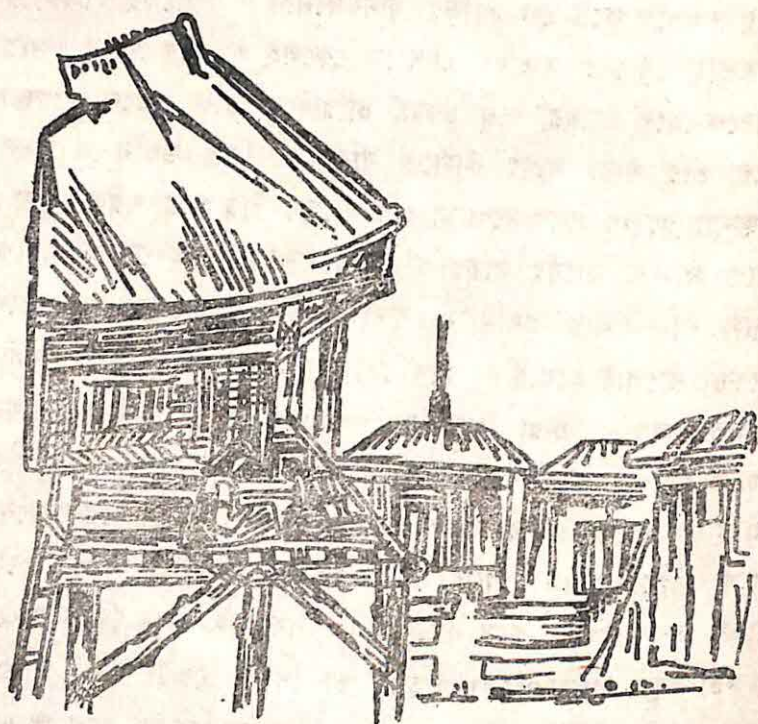
মেয়েকে নিয়ে মা ঘরে ঢুকলেন। বললেন, ছাখ এখনি আমার ভায়েরা আসবে। দেখবে আমি মরে গেছি কিনা। তারপর ওরা

তিনটে বস্তা করে সমস্ত টাকাপয়সা নিয়ে যাবে। তোমার জন্যে শুধু রেখে যাবে তিনটে হার। আর নিয়ে যাবে সমস্ত গরু-বাছুর-মোষ। তোমার জন্যে শুধু থাকবে একটা বক্না বাছুর। তুমি মোটেই দুঃখ কোর না। হারগুলো ব্যবহার করবে। আর বাছুরটাকে যত্ন করবে। তোমার ভাবনার কারণ নেই। সাতদিনের মধ্যেই একজন লোক এখানে আসবে। সে তোমাকে বিয়ে করবে। তোমার ছেলেরাই হবে এ-গ্রামের মাথা। যাও, এখন তোমার ঘরে গিয়ে বস। মেয়ে চোখের জল বুকে চেপে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল।

পৃথিবী তখনো অন্ধকার। একটু পরেই সাত ভাই আবার এল বোনের বাড়ী। কিন্তু তারা আর তার বোনের মৃতদেহ দেখতে পেল না। কেবল দেখল একটা চওড়া রক্তের ধারা ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে চলে গেছে একটু দূরে একটা পুকুরের মধ্যে। এরপর ভায়েরা বোনের সমস্ত সোনাদানা পয়সাকড়ি তিনটে বস্তায় বাঁধল, গরু-মোষ-ছাগল গোয়াল থেকে বের করল। তারপর রওনা দিল নিজেদের নিজেদের বাড়ির দিকে। ওদের ভাগ্নীর জন্যে শুধু রেখে গেল তিনছড়া হার আর একটা বক্না বাছুর। আর তখন ওদের বোন পুকুরের নিচে একটা গভীর কুয়োর মধ্যে বসে আরো ক্ষমতা আয়ত্ত করার জন্যে সাতদিনের তপস্যায় বসেছে।

এদিকে ঠিক সাতদিনের দিন এক শিকারী এসে উপস্থিত মেয়ের কাছে। মা যেমনটি বলে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গেই ওই শিকারীর বিয়ে হোল। তারা ঘর সংসার শুরু করল সুখে।

ঠিক ওইদিনই পুকুরের তলা থেকে তপস্যা শেষ করে বেরিয়ে এল সাত ভায়ের নিহত বোন। এখন সে এক ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী প্রেতিনী। আর এই প্রেতিনীই হোল গীন্থ মুঙ। ভায়েরা তাকে অসহায় পেয়ে তাকে খুন করে সমস্ত কিছু নিয়ে নিয়েছিল বলে, সে

কেবল সেই সাত ভাইকে সর্বস্বান্ত করেই ক্ষান্ত হোল না। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে সমস্ত পয়সাওয়ালা লোকের ওপর। আর তারপর থেকেই তো প্রবাদটা চালু হয়, পয়সার গরম কখনো বাইরে দেখিও না।

আকাশ ছোঁয়া

পাহাড়তলীর এক গ্রাম।

ছোট গ্রাম। কিন্তু এ-গ্রামের লোকেরা বড় সুখী। মাটি উর্বরা। সামান্য পরিশ্রমেই ফসলে ভরে যায় মাঠ। তারপর ফসল ঘরে তুললেই নিশ্চিন্ত আরাম। সারা বছর না খাওয়ার ভাবনা, না উদয়াস্ত কষ্টের তরাস। তাই গাঁয়ের লোকেরা সবসময় মজলিশ আর আনন্দে দিন গুজরান করত। আশেপাশের আর দূরের গ্রামের লোকেদের কিন্তু ছিল এদের ওপর ভীষণ হিংসে। কারই বা না হয়। অন্যেরা যখন সারা বছর পরিশ্রম করেও দুবেলা পেটের ভাত ফলাতে পারে না, এরা তখন বছরে তিন মাস খেটেই, সারা বছর সুখে থাকে। কিন্তু এত হিংসে সত্ত্বেও অন্যগাঁয়ের লোকেরা এদের সমীহ করে চলত। কারণ ওদের বিচারে এরা ছিল জ্ঞানী। আর কখন যে নিজেদের বিপদে-আপদে ওই জ্ঞানী বৃদ্ধদের সাহায্যের দরকার হবে, কে বলতে পারে। তাই ধরমদীন গ্রাম সম্পর্কে সকলেরই সমীহ।

এই ধরমদীন গ্রামে এক বিকেলে গাঁওবুড়োরা হুঁকো নিয়ে আলোচনায় বসেছেন। এরকম ওঁরা প্রায়ই বসেন। কিন্তু আজকের আলোচনা খুবই গুরুতর। বিষয় হোল, তারা যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে আকাশটা কতদূর উঁচুতে। মুশকিল হোল এই বিষয়টা নিয়ে এর আগে তাদের কেউই ভাবে নি। তাই সকলেই এখন ভীষণ চিন্তায় পড়ল। তাইতো, আকাশটা আসলে কতটা উঁচু।

ভাবনায়, চিন্তায় এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকল। সকলের মুখে কঠিন গাম্ভীর্য। কেউ কথা বলতে পারছে না। অথচ সকলের মনের ইচ্ছে আকাশটাকে ছোঁয়া। সুদূরকে হাতের নাগালে

নিয়ে আসা। গাঁওবুড়োরা ভাবতে থাকল। মন তাদের আকাশ ছুঁয়েছে। এখন ইচ্ছে হাত বাড়িয়ে আকাশ ছোঁয়া।

সকলের মন যখন এরকম ভাবনায় চিন্তায় অস্থির, তখনি হঠাৎ একজন কথা বলে উঠল, আকাশ সে আর কি এমন উঁচুতে। মাইল খানেক। বড় জোর দু'মাইল। কিন্তু কেউই তার কথায় বিশেষ আমল দিল না। আরে, না, না। ওসব একমাইল দুমাইলের ব্যাপার নয়। আকাশ অনেক উঁচু। কেউ একজন কথা বলল। তারপর আবার সব চুপচাপ। পাখিদের শোঁ শোঁ শব্দ। পাহাড়ী ঝর্না থেকে নদী নামছে সমতলে। পাইন-ঝাউ বেলাশেষের বাতাসের শব্দে কাঁপছে।

অনেকক্ষণ পরে অন্য এক বিজ্ঞ বলে উঠল, আরে আকাশ-টাকাশ বলে আসলে কিছুই নেই। সবটাই আসলে কল্পনা। অন্য বিজ্ঞ লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে এমন করে হাসল, যেন একজন নির্বোধ আবোল-তাবোল বকছে। তাই তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে অন্যজন বলল, থাম, থাম। কল্পনা হলে কি আমরা আকাশকে চর্মচক্ষে দেখতে পেতাম। আমার মনে হয় হিমালয়ের চূড়ায় উঠলেই আকাশ ছোঁয়া যায়। অন্যজন চেঁচিয়ে উঠল, অসম্ভব। অসম্ভব। পাহাড়ের চূড়া সবচেয়ে উঁচু, সন্দেহ নেই। কিন্তু আকাশ তার চেয়েও উঁচু অনেক উঁচু।

সকলে এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। কথা খেই হারাল। আকাশ উঁচু। অনেক উঁচু। তবু সকলেই আকাশ ছুঁতে চায়। কিন্তু কেমন করে। কারো মাথায় কিছু আসছে না। তবু সবাই ভাবছে। অবশেষে কেউ একজন প্রস্তাব করল, ওসব হিসেব পত্তর না করে, এসো বরং একটা মিনার গড়ে তোলা যাক। খুব খুব উঁচু মিনার। আর সেটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে অনায়াসেই আকাশ ছোঁয়া যাবে। সকলে আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হোক। মিনারের মাথায় উঠে আমরা আকাশ ছোঁব।

কিন্তু মিনার হলেই তো হোল না। মিনারটা এমন হওয়া চাই যে সেটার-মাথায় ওঠা যাবে। তখন সকলে মিলে ঠিক করল যে সেটাকে তৈরি করবে মাটির হাঁড়ি দিয়ে। যারা ওই মিনার গড়বে তারা অনায়াসেই হাঁড়ি সাজাতে সাজাতে উপরে উঠে যাবে। তারপর আর আকাশ ছোঁয়ার কোন সমস্যা থাকবে না।

সেদিনের মত সভা ভাঙল। লোকেরা যে যার ঘরে ফিরল। কিন্তু তাদের সকলের মনেই তখন কী ভীষণ উত্তেজনা। আর পরদিন সকাল হতে না হতেই সে উত্তেজনা ছড়িয়ে গেল সমস্ত গ্রামে। সকলের মনেই তখন একমাত্র ভাবনা কবে মিনার তৈরি শেষ হবে। কবে আকাশ আসবে হাতের নাগালে।

গ্রামের সব জোয়ান মরদেরা সেদিন বেরিয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামান্তরে। দেশে দেশান্তরে। যেখানে যত মাটির হাঁড়ি ছিল, একে একে এসে জমতে থাকল সে-গ্রামে। কদিনের মধ্যে এমন অবস্থা হোল যে রাস্তা-ঘাট মাঠ-প্রান্তর বাড়ি ঘর কিছুই আর দেখা যায় না। চারিদিকে শুধু হাঁড়ি আর হাঁড়ি। তারপর যখন সব মরদ ঘরে ফিরল, তখন আবার গ্রামের প্রাজ্ঞ বৃদ্ধেরা বসছেন দিন ঠিক করতে। কবে মিনার গড়া শুরু হবে।

তারপর শুভদিনে, শুভক্ষণে মিনার গড়া শুরু হোল। দুজন সাহসী যুবককে আগেই নির্বাচন করা হয়েছিল। এখন দেবতাকে প্রণাম করে, গ্রাম বৃদ্ধদের প্রণাম করে মিনার গড়া শুরু হোল। হাঁড়ির পর হাঁড়ি সাজিয়ে ওরা দুজন একের পর এক ধাপ উপরে উঠছে। সমস্ত জায়গাটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে গাঁয়ের কয়েক শ' মানুষ। ওরা উঠছে। নিচে উল্লাসের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ওরা উঠছে।

এভাবে উপরে উঠতে উঠতে ওরা এত উঁচুতে পৌঁছল যে নিচের লোকেরা আর ওদের ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। তবে কি ওরা এখন আকাশের কাছাকাছি। আকাশ আর কতদূর।

এদিকে হাঁড়ি ফুরিয়ে এসেছে। আকাশে সূর্য ঢলে পড়েছে। আবছা আলো অন্ধকারে হাঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তুজনের মনে হোল
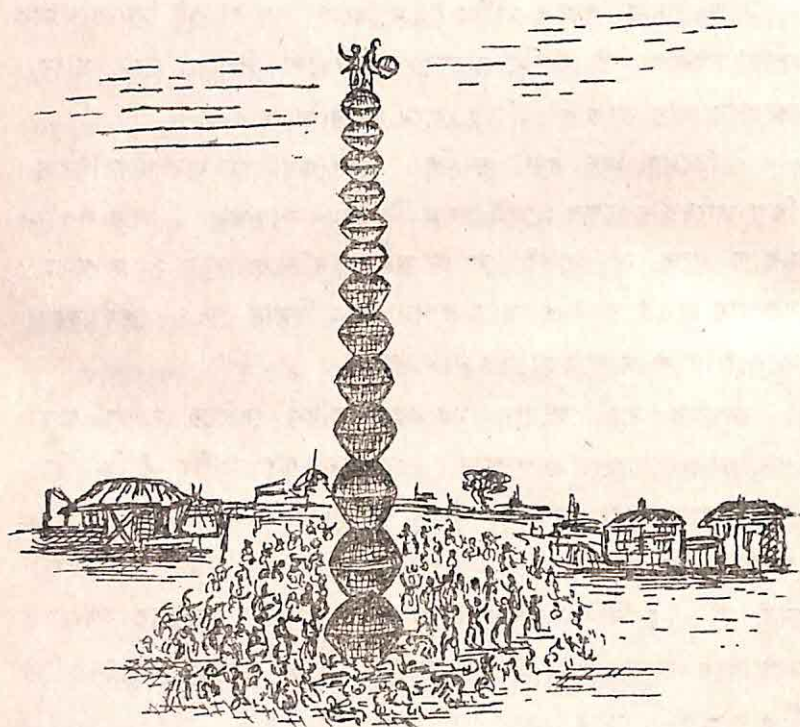
আকাশ এখন তাদের হাতের খুব কাছাকাছি। এখন একটা ছোট বাঁশ বা কাঠি হলেই তারা আকাশ ছুঁতে পারবে। তাই ওপরে দাঁড়িয়েই তারা নিচের লোকদের উদ্দেশে লেপচা ভাষায় চিৎকার করে বলে উঠল, কক্ বিং ইয়ান তাং। আমাদের তুটো লগি পাঠাও। অত উপর থেকে বলা কোন কথাই কিন্তু এদিকে নিচের লোকেরা শুনতে পাচ্ছিল না। কেবল একটা শব্দই যেন তাদের কানে বাজল, চাকতা। অর্থাৎ এটা ভেঙে ফেল।

সে কি। এত পরিশ্রমে বানানো মিনার আমরা ভেঙে ফেলব। উপরের লোকগুলো কি পাগল হয়ে গেল। না, না। এটা করা

যায় না। কিন্তু ওরাই বা বলছে কেন। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। তাই নিচের লোকেরা চিৎকার করে ওদের শুধোল, চাকতা? আবার উপরের দুজন চিৎকার করে উঠল, কক্ বিঙ ইয়ান তাং। নিচের সকলে আবার শুনল, চাকতা। উপরের লোকদুটো আবার একই কথা চিৎকার করে বলল। কিন্তু এরা 'চাকতা' ছাড়া অন্য কিছুই শুনল না।

তখন গাঁয়ের বিজ্ঞ লোকেরা ওই মিনারটা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিল। নিচের কয়েকটা হাঁড়ি ধরে টান দিতেই মিনারটা ভীষণ শব্দে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। ওপরের লোকদুটো একে সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিল, তারপর অত উঁচু থেকে পড়ে যাওয়ার ধাক্কা। ওদের মৃত্যু হোল।

গাঁয়ের বুড়ো বিজ্ঞ লোকেরা তখন ওই দুটো মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবল, তবে কি ওরা আকাশ ছুঁয়েছিল।

অত্যাচারী রাজা

অনেক অনেকদিন আগে দেশে একজন রাজা ছিলেন। যেমন ছিল তাঁর পরাক্রম, তেমন ছিল দৃঢ়তা। একহাতে তিনি পরাজিত করতেন শত্রুদের। আর অন্যহাতে নির্মমভাবে শাসন করতেন আপন প্রজাদের। কিন্তু এই নির্মমতা যে কি পরিমাণ নিষ্ঠুরতায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তা একমাত্র জানত তাঁর প্রজারা আর জানত বনের পশুপাখিরা। তাই সমস্ত রাজ্য জুড়ে লোকের ঘরে ঘরে জেগে উঠেছিল হাহাকার আর দেবতার কাছে প্রার্থনা। ভগবান, এই অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা কর। চোর-ডাকাতের অত্যাচার হলে আমরা রাজার কাছে দরবারে যেতে পারতাম। কিন্তু রাজার অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে তো তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। আর ওদিকে বনের পশুপাখিরাও গিয়ে কেঁদে পড়ল ভগবানের কাছে। রাজা প্রতিদিন শিকারে আসেন। প্রতিদিন রাশি রাশি পশুপাখি অকারণে রাজার খেয়ালে প্রাণ হারায়। বন যে পশুপাখি শূন্য হতে চলল। তুমি আমাদের রক্ষা কর ভগবান।

সকলের কান্নায় দেবতা বিচলিত হলেন। ভাবলেন, রাজা তো আমারই অংশ। তাঁকে তো নিধন করা চলে না। অথচ লোকের কান্না, পশুপাখিদের চোখের জল, এসবও তো নিবারণ করতে হবে। দেবতা তাই রাজার মনের পরিবর্তন ঘটাবেন ঠিক করলেন। কিন্তু কেমন করে। দেবতাকে তাহলে যে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়। দেবতা ভাবলেন তাই সই। সকলের চোখের জল আর কান্নায় এদিকে যে পৃথিবী ভেসে যায়।

এরপর একদিন, অন্য সব দিনের মত, রাজা এসেছেন বনে। পশুপাখি শিকার করতে। বিরাট সাদা ঘোড়ার পিঠে। হাতে

তলোয়ার। কাঁধে তীর-ধনুক। দেবতা তাকে ওপর থেকে দেখলেন। আর তারপরই একটা বিরাটকায় শকুনের রূপ ধরে আকাশ অন্ধকার করে সোজা তীর বেগে নেমে এলেন রাজার মাথা লক্ষ্য করে। রাজা এত বড় শকুন কখনও দেখেন নি। তার ওপর শকুনের লক্ষ্য তাঁর মাথা। রাজা ভয় পেলেন। ভীষণ ভয়। ভুলে গেলেন তলোয়ার ওঠানোর কথা। ভুলে গেলেন তীর-ধনুকের কথা। হঠাৎই তাঁর মাথাটা ঘুরে গেল। আর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন ঘোড়ার ওপর থেকে নিচে। কিন্তু তাঁর গায়ে এতটুকু চোট লাগল না। দেবতা তখনি তাঁকে ধরে আস্তে আস্তে নিচে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।

এরপরই দেবতা শকুনের রূপ বদল করে এক পরম রূপবান যুবকের মূর্তি ধরে ঘোড়ার লাগাম হাতে মূর্ছিত রাজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে রাজার জ্ঞান ফিরে আসতেই, পাশে দাঁড়ানো ওই সুদর্শন যুবককে দেখে, তিনি খুবই অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে। এখানে আমার পাশেই বা দাঁড়িয়ে আছ কেন। দেবতা বললেন, আমি আপনারই প্রজা। এই পথে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আপনাকে আক্রান্ত দেখে, আপনার জীবন রক্ষা করেছি। আর এখন ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছি, পাছে আপনার ফেরার কোন কষ্ট হয়। এখন আপনি আপনার ঘোড়ার লাগাম হাতে নিন। আমি চললাম। এ-কথা বলে দেবতা যেই পেছন ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছেন, রাজা তাকে বাধা দিলেন। না, না, যেও না। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমাকে এভাবে ছেড়ে দিলে আমার অকল্যাণ হবে। তুমি আমার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে চল। দেবতাও মনে মনে এই চাইছিলেন। কিন্তু মুখে কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। বললেন, বেশ চলুন।

পথ চলতে চলতে রাজা কথা বলছেন দেবতার সঙ্গে। দেবতা যথারীতি উত্তর দিয়ে চলেছেন। রাজা জিজ্ঞেস করেছেন দেবতার

নাম। দেবতা বলেছেন, তার নাম কর্থক উক্দে। রাজা দেবতাকে নিয়ে প্রাসাদে পৌঁছলেন। সসম্মানে কর্থককে বসালেন। তারপরই ডেকে পাঠালেন অমাত্যদের।

রাজা সকলকে বললেন জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে, তিনি কি বিপদে পড়েছিলেন আর কেমন করে কর্থক তার প্রাণ রক্ষা করেছে। সকলে কর্থকের প্রশংসায় মুখর হোল। রাজা বললেন, এখন আমার উচিত ওকে পুরস্কৃত করা। আর সেজন্যেই আমি ওকে এখানে আবাহন করে এনেছি। অমাত্যরা এবার রাজার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। আর সকলের অবাক চোখের দৃষ্টির সামনে রাজা কর্থককে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করলেন।

মন্ত্রী হিসাবে কর্থক দায়িত্বভার গ্রহণ করেই প্রজাদের মঙ্গলসাধনে যত্নবান হলেন। রাজাও কর্থককে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। সুতরাং দেশে প্রজাদের ওপর অত্যাচার বন্ধ হোল। প্রজাদের মুখে আবার হাসি ফুটল। তারা কর্থককে ভীষণভাবে ভালবেসে ফেলল। রাজ্যের সর্বত্রই কর্থকের নাম। সর্বত্রই তার নামে জয়ধ্বনি। রাজাও মনে মনে খুশি হলেন। ভীষণ খুশি। এতদিনে তিনি একজন মানুষ খুঁজে পেয়েছেন। কর্থকও প্রাণপণে দেশের সেবা করে যাচ্ছেন। দেশের সর্বত্র আনন্দ। প্রজারা সুখী।

রাজা এ-আনন্দ, এ-সার্থকতাকে স্মরণীয় করে রাখতে সারা দেশে একদিন উৎসবের আয়োজন করলেন। রাজকোষ থেকে তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা হবে। ঠিক হোল প্রাসাদের মাঠে বড় বড় চাঁদোয়া টাঙানো হবে। আর দেশের সমস্ত লোক সেদিন আসবে তাদের সবচেয়ে ভাল জামা কাপড় আর গয়না পরে। সকলেই সেদিন আনন্দ করুক, আনন্দের ভাগ পাক, রাজার মনে এই ইচ্ছে।

এদিকে তখন রাজপ্রাসাদে অন্য দৃশ্য। রাজার ছিল দুই রানী। উৎসবের দিনের জন্যে বড় রানী রাজার কাছে চাইলেন সবচেয়ে
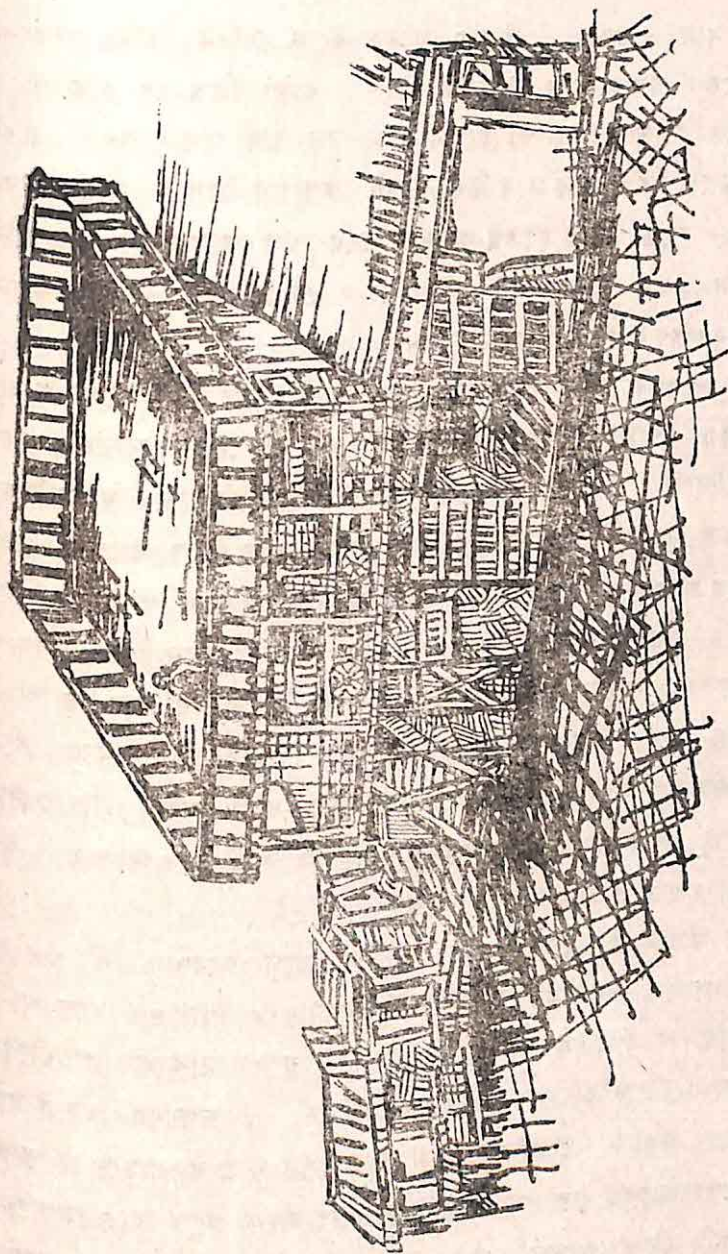
মূল্যবান হারছড়া। তাঁরও মনের ইচ্ছে সেদিন তিনিই সাজবেন সবচেয়ে সুন্দর আর ঐশ্বর্যের সাজে। রাজা কিন্তু সে হার তাঁকে দিতে কিছুতেই রাজী হলেন না। বড় রানী ক্ষুব্ধ হলেন। এতই ক্ষুব্ধ যে, তিনি মনে মনে ঠিক করেই ফেললেন উৎসবে যোগ দেবেন না। সন্ধ্যে পার হতেই আকাশ ভরে গেল জ্যোৎস্নায়! বড় রানী এসে ছাদে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ ফেটে জল এল। বড়রানী অনেকক্ষণ ছাদে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর রাত বাড়তেই ছাদ থেকে নেমে রানী এলেন খাবার ঘরে। এসেই দেখলেন সেই দৃশ্য। রাজা খেতে বসেছেন, সঙ্গে ছোটরানী। আর ছোটরানীর গলায় সেই মহামূল্যবান মণিমাণিক্য-খচিত হারছড়া। বড়রানীর সারা শরীর জ্বলে উঠল রাগে। চোখ দিয়ে আগুন ছুটতে থাকল। কি, আমাকে এতবড় অপমান। ছুটে গিয়ে বড়রানী ছোটরানীর গলা থেকে হারছড়া টেনে ছিঁড়ে নিলেন। তারপর হারছড়াকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে সারা ঘরে ছড়ালেন। কিন্তু এতেও তাঁর রাগ শান্ত হোল না। ছোটরানীর সামনে থেকে খাওয়ার থালা একটানে কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিলেন। আর তাঁর দিকে তাকিয়ে চীৎকার করতে থাকলেন, ডাইনী কোথাকার। দূর হ। দূর হ আমার সামনে থেকে।

স্বভাবতই, রাজা এতে ভয়ানক রেগে গেলেন। কী এত বড় আস্পর্ধা। আমার সামনে এই অপমান। দাঁড়াও। এর শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে রাজা ডাকলেন প্রহরীকে। বললেন, এক্ষুনি ডেকে নিয়ে এস মন্ত্রীকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্ত্রী কর্থক উকুদে করজোড়ে এসে দাঁড়ালেন রাজার সামনে। রাজা তৎক্ষণাৎ হুকুম করলেন, যাও, এই বড়রানীকে নিয়ে যাও মশানে। এক্ষুনি ওকে কোতল করবে। ছদ্মবেশী দেবতা কর্থক সবই বুঝলেন। বললেন, রাজা ক্রোধের বসে আপনি যা বলছেন, তা হয়ত আপনার

মনের বাসনা নয়। এ-আদেশ দেবার আগে তাই অন্তত একবার ভেবে দেখুন। বড়রানী হয়ত অপরাধ করেছেন। কিন্তু আপনি তো রাজা। এবারের মত তাকে মার্জনা করুন। রাজা বললেন, না এ-অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। যাও, ওকে নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। কর্থক তবু হাল ছাড়লেন না। রাজাকে নানা কথায় বহু অনুনয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাজা তখন ক্রোধান্ত। তাই তাঁর আদেশের কোন বদল হোল না। আর রাজাদেশ। পালন না করেও উপায় নেই। তাই কর্থক বড় রানীকে নিয়ে চললেন গভীর অরণ্যে। তারপর এক নিরাপদ গুহার মধ্যে তাঁকে লুকিয়ে রেখে ফিরে এলেন প্রাসাদে। রাজাকে জানালেন বড়রানীকে হত্যা করা হয়েছে।

রাগ পড়ে যেতেই পরদিন থেকে রাজা কেমন মনমরা হয়ে পড়লেন। আর হাসেন না, আর রাজসভায় ঠিকমত বিচারে মন দিতে পারেন না। কর্থক সবই বোঝেন। আর তারপর থেকেই, কর্থকরূপী দেবতা রাজাকে দিবারাত্র উপদেশ দেন। ক্রোধ এবং হিংসা পরিত্যাগ কর। ক্রোধের কারণে আজ যা সত্য বলে মনে করছ, ক্রোধ শান্ত হয়ে গেলে তার জন্যে অনুতাপ করতে হয়। রাজা নিঃশব্দে শুনে যান। তাঁর মনেও তখন অশান্তি। তারপরই একদিন সময় বুঝে কর্থক রাজাকে একটা গল্প বললেন।

অনেক অনেকদিন আগে এক জঙ্গলে বাস করত এক মোরগ আর মুরগী। একটা গাছের ডালে বাস করে তারা থাকত। এমনিতে খাদ্যের অভাব তাদের থাকত না। কিন্তু বছরের একটা সময়ে, যখন কোথাও ফসলের চাষ হোত না, তখন তাদের খাবার সংগ্রহ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ত। তাই তারা ঠিক করল যে বছরের ওই দুঃসময়ের জন্যে খাদ্য সংগ্রহ করে রাখবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মোরগ আর মুরগী মিলে সংগ্রহের কাজে লেগে গেল। সারাদিন

খুঁটে খুঁটে যা আনে, তার অর্ধেক গাছের ওপরে বাসায় রাখে আর বাকী অর্ধেক খায়। এমন করে দিনের পর দিন কাটল। এরপরই এলো মুরগীর ডিম পাড়ার সময়। মুরগী উঠে গেল বাসায়। সারাদিন মোরগ ঘোরে খাবারের সন্ধানে আর মুরগী বাসায় বসে ডিম পাড়ে আর তা দেয়।

এভাবেই মোরগ আর মুরগীর দিন কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন মোরগ গাছের ওপরে বাসায় উঠল। আর উঠেই দেখল যে বাসায় একটুও খাবার নেই। এতদিন ধরে দুজনে যত খাবার সঞ্চয় করেছিল তা সব শেষ। মুরগীর এসব দিকে আদৌ খেয়াল ছিল না। সে একমনে ডিমে তা দিয়ে চলেছে। মোরগ তাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেল সেই খাবার। মুরগী সরল মনে সত্যি কথাই বলল। সে জানত তো ওই সঞ্চিত খাদ্য কোথায় গেল। কিন্তু মোরগ তখন রাগে ফুঁসছে। ঝুঁড়ি উঁচিয়ে সে মুরগীর দিকে তেড়ে গেল। কারণ তার ধারণা মুরগী বাসায় বসে সবই খেয়ে ফেলেছে। মুরগী যত অস্বীকার করে, মোরগের রাগ তত বাড়ে। আর রাগের চোটে ঠোঁট দিয়ে মুরগীর মাথা ঠোকরায়। এভাবে ঠোকরানর ফলে একসময় মুরগীটা মরে গেল।

মুরগী মরে যেতেই মোরগ বাসা ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু মনের মধ্যে জমা রাগ বিন্দুমাত্র কমল না। অনেকদিন কেটে গেল। গ্রীষ্ম পেরিয়ে বর্ষা এল। মোরগের কি খেয়াল হোল, গেল পুরনো বাসার দিকে। আর যে গাছে তাদের বাসা ছিল, সে গাছের নিচে তাকাতেই সে চমকে উঠল। দেখল গাছের গোড়াটা ভরে গেছে গমের চারায়। এখন সে বুঝল যে মুরগী এক দানাও খায় নি। আসলে বাসা থেকে সমস্ত গমটা ঝরে ঝরে পড়েছে নিচে। আর এখন বর্ষার জল পেতেই সেগুলো থেকে চারা বেরিয়েছে। দুঃখে আর বেদনায় ভরে গেল মোরগের মন। কিন্তু কি হবে। মুরগীকে তো আর ফিরে পাবে না।

রাজা, এখন তো তুমি বুঝতে পারছ রাগ কি বস্তু। আর রাগের মাথায় হত্যা করাও অত্যন্ত সহজ। কিন্তু যখন তুমি কোন প্রাণীর জীবন দিতে পার না, তখন হত্যা করার কি কোন অধিকার তোমার আছে। রাজা কিন্তু এত সহজে কর্থকের উপদেশ মেনে নিতে পারেন না। তাঁর মনে তখন কোন অনুতাপ আসে নি। বললেন, কিন্তু অপরাধ করলেও তাকে সাজা দেওয়া অনুচিত। আমার অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যু। কর্থক বললেন, না, রাজা না। তুমি রাজা, তোমার কি সাধারণের মত রাগ দেখান শোভা পায়। তুমি তো অনেক বড়। সাধারণের চেয়ে অনেক বড়। তুমিই তো ক্ষমা করবে। সেখানেই তো তোমার মহত্ত্ব। আর তোমার সে-মহত্ত্ব দেখেই তো দেশের লোক ক্ষমাশীল এবং দয়ালু হবে।

রাজা চুপ করে রইলেন। রাজা ভাবতে থাকলেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর হৃদয়ে পরিবর্তন এল। দেবতার আশীর্বাদ তাঁকে শুদ্ধ করল। রাজা ভাবলেন, ঠিকই রাগের বসে তো আমি সব রকম অন্যায়ই করেছি আর ভবিষ্যতেও করতে পারি। রাগের জন্যেই তো আমি আমার বড়রানীকে হারালাম। এখন বড়রানীর জন্যে তাঁর কষ্ট হোল। রাজা কর্থককে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। সত্যিই রাগের বশে আমি অনেক অনেক অন্যায় করেছি। এখন বল কি করলে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে। কর্থক বললেন, প্রতিজ্ঞা করো, আর কোনদিন রাগের বসে কোন অন্যায় করবে না। সব সময়েই ক্রোধ দমন করতে চেষ্টা করবে। রাজা কর্থকের হাত ধরলেন। বললেন, আমি আমার সব অপরাধ স্বীকার করছি। ভবিষ্যতে কোনদিন আর রাগের বশে হত্যার আদেশ দেব না। রাগ দমন করতে চেষ্টা করব। রাজা একথা বললেন। বারংবার বললেন। তাঁর কপোল বেয়ে নেমে এল অশ্রুজল। সেই কান্না ভেজা গলায় শুধু একবার

ফিসফিস করে বললেন, আজ যদি আমার বড়রানী জীবিত থাকত।

কর্থকের অভীষ্ট কাজ সিদ্ধ হোল। তিনি পর্বতগুহা থেকে নিয়ে এলেন বড়রানীকে। রাজা যার পর নাই খুশি হয়ে কর্থককে জড়িয়ে ধরলেন। কর্থক বললেন, আমার কাজ শেষ, আমি চললাম। রাজা চমকে কর্থকের দিকে তাকালেন। দেখলেন, কর্থকের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরই উপাস্য দেবতা।

এক আদি জনকের কাহিনী

কোন সে অনাদি অতীতের কথা। তিস্তা নদীর ধারে এক পাহাড়ী গুহায় থাকতেন সর্পদেবতা নাগরাজ। যেমন বিরাট লম্বা তাঁর শরীর তেমন বিরাট মাথা আর হাঁ। লাল চোখ ছুটো সবসময়ে ভাঁটার মত জ্বলছে। আর কি ভয়ঙ্কর হিস্‌হিস্ শব্দ। এ-গুহার. ধারে কাছে অথবা তিস্তার পাড়ে, ভয়ে তাই কোন জীবজন্তু আসে না। সর্পরাজ আপন মনে পাহাড়ের গায়ে, তিস্তার ঢেউ-নামা জলের ধারে, অথবা আশপাশের বনাঞ্চলে বিচরণ করেন। কখনও দেখেন দূর লেপচা গ্রাম থেকে কলসি মাথায় মেয়েরা আসে জল আনতে। সর্পদেবতা দেখেন। তিস্তার স্বচ্ছ জলে মৎস্যকন্যারা জলকেলি করে। সর্পদেবতা দেখে খুশি হন। কিন্তু এই নির্জন পাহাড়ী গুহায় একাকী পরিবেশে সর্পদেবতা ভীষণ ভীষণ ক্লান্ত বোধ করেন। সঙ্গীহীন বেদনাবোধ তাঁকে বড় বেশি করে পেয়ে বসে। সর্পদেবতা মনে মনে এখন সঙ্গী খোঁজেন।

এরপরই একদিন যখন তিস্তা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সর্পদেব, তাঁর দেখা হয়ে গেল এক মৎস্যকন্যার সঙ্গে। মৎস্যকন্যা জল থেকে উঠে এসে সর্পদেবকে প্রণাম করল। ছুজন ছুজনকে জানলেন। সর্পদেবের ভাল লাগল মৎস্যকন্যাকে। এরপর রোজই ছুজনের দেখা হয় তিস্তা নদীর ধারে। সোঁসোঁ শব্দে জলধারা বয়ে যায়। সময়ও পেরোয়। তারপর একদিন সর্পদেব বিয়ে করে মৎস্যকন্যাকে ঘরে আনলেন। গুহায় থাকেন ছুজনে। সর্পদেব আর মৎস্যকন্যা। সময়ের হাত ধরে ছুজনেরই বয়স বাড়তে থাকে। সর্পদেবতা এখন ছুই ছেলের পিতা। ছেলেরাও থাকে বাপ-মায়ের সঙ্গে গুহায়।

ছেলেরাও বাপের মত বনে-জঙ্গলে ঘোরে। পাহাড়ে নদীর ধারে। তারপর একসময় ছেলেরাও যুবক হয়। বাপের বয়স বাড়ে। মায়েরও। প্রায় বৃদ্ধ সর্পদেব এখন আর গুহা ছেড়ে বাইরে যান না। মৎস্যকন্যাও দিবারাত্র ঘরে থাকে তাই গুহার বাইরের জগতে যা কিছু ঘটে তার সব কিছুই থাকে বৃদ্ধ বৃদ্ধার অগোচর।

এদিকে সর্পদেবের বড়ছেলে একদিন ঘুরতে বেরিয়েছে। তিস্তার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বনের মধ্যে ঢুকেছে। তারপর এগোচ্ছিল সোজা লেপচা গ্রামের দিকে তখনই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একজন লেপচা মেয়ের। মেয়েটা বনে এসেছিল কাঠ কুড়োতে। ছেলেটা মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হোল। এর আগে ও কখনো কোন মেয়েকেই দেখেনি। সুন্দরী মেয়ে তো দূরের কথা। সে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলল। মেয়েটিরও তরুণ যুবককে ভাল লেগেছিল। এর পর থেকে কোনদিন বনের গভীরে, কোনদিন তিস্তার পাড়ে, কোনদিন বা পাহাড়ের কোন ফুলে ফুলে ভরা খাড়াইয়ে দুজনের দেখা হয়। দুজন অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের কথা বলে। তারপর ছেলেটা ফেরে নিজেদের গুহার দিকে। মেয়েটা চলে যায় গ্রামে। এভাবে কিছুদিন চলল। তারপরই ওরা দুজন বিয়ে করল। কিন্তু ছেলেটা বউকে নিয়ে গেল না গুহায়। বউ যেমন ছিল বাপের বাড়ি তেমনি রইল। আর ছেলে রইল বাপ-মা-ভায়ের সঙ্গে গুহায়। দিনে দুজনের দেখা হয় নির্জনে। রাতে ওরা আগের মতই ফেরে যে-যার ঘরে। এমনি করে দিন যায়।

এদিকে সর্পদেব প্রতিদিন ছেলেকে দেখেন। মৎস্যকন্যা মা ছেলেকে দেখে। ছেলের পরিবর্তন তখন আর অগোচর নেই। কিন্তু কেউই জানেন না কি হয়েছে। বাবা ভাবেন, তাইতো ছেলের কি হোল। মা ভাবেন, ছেলে এমন উন্মনা হয়ে বাড়ি ফেরে কেন। সর্পদেবতা আর মৎস্যকন্যা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন দিনের

পর দিন। কিন্তু কেউই জিজ্ঞেস করতে পারেন না। কিন্তু যতই দিন যায়, ছেলের বিমর্ষতা ততই বাড়তে থাকে। তার চোখে মুখে বেদনার ছাপ বড় বেশি করে ফুটে ওঠে। বাবার মনে কষ্ট হয়। মায়ের চোখে জল ঝরে। অবশেষে নিজেরা কথা বলে মা ঠিক করেন, ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবেন। ছেলের মুখের দিকে তাকালে যে তাদের বুক ফাটে।

সেদিন রাতে ছেলে বাড়ি ফিরতেই মা ছেলেকে ধরলেন। বল বাবা, তোমার কি হয়েছে। দিনে দিনে তোমার মুখের ওপর কাল
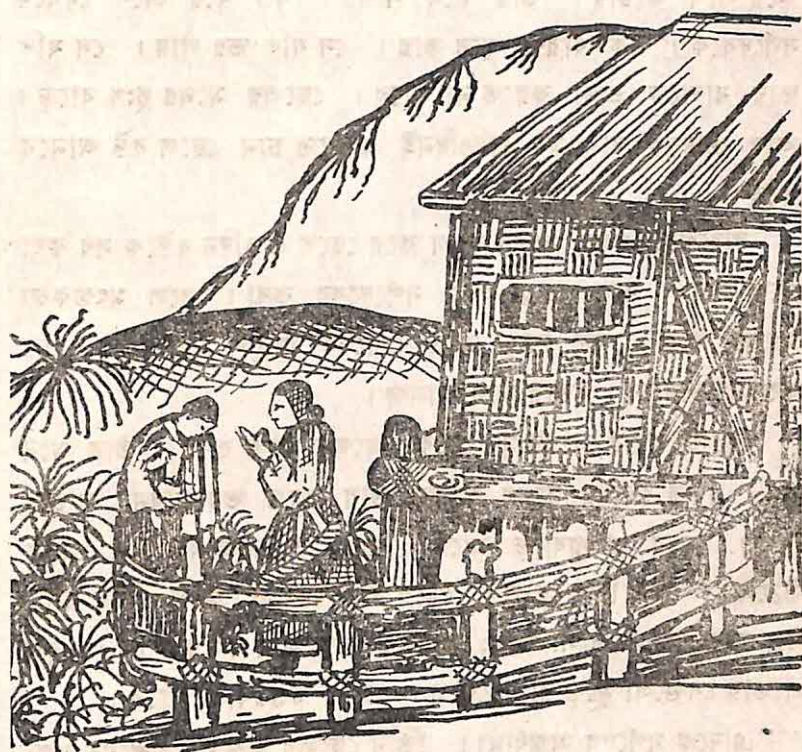
ছাপ পড়ছে। সব সময়ে মুখ ভার করে থাক। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই। বল বাবা, আমার কাছে খুলে বল, তোমার কি হয়েছে। ছেলে কিছু হয়নি বলে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু মা

নাছোড়বান্দা। অবশেষে মায়ের পীড়াপীড়িতে ছেলে মাকে সব কথা খুলে বলে। লেপচা মেয়েটির কথা। নিজেদের বিয়ের কথা। শুনে মায়ের তো আর আনন্দ ধরে না। ছুটে যান সর্পদেবের কাছে। বলেন সব কথা। ছেলের বিয়ের কথা। সর্পদেব খুশি হন। খুব খুশি।

এরপর থেকেই বাবা-মা, দুজনেই ছেলেকে বউ ঘরে আনার জন্যে তাগাদা দিতে থাকেন। মা বলেন, বাবা এবার বউকে ঘরে আন। বাবা বলেন, কবে আনবে বউমাকে। ছেলে কিন্তু আনছি, আনব করে পাশ কাটায়। তার মনে সংশয়। বউ ঘরে এসে দেখবে সর্পদেবকে। কি ধারণা হবে তার। সে যদি ভয় পায়। সে যদি তার বাবাকে শ্রদ্ধা করতে না পারে। ছেলের মনের দুঃখ বাড়ে। আর এদিকে বাবা-মা প্রতিদিনই জানতে চান ছেলে বউ আনবে কবে।

অবশেষে সকল সংশয় ত্যাগ করে ছেলে একদিন বউকে সব কথা খুলে বলে। বলে, তার বাবা সর্পদেবের কথা। বলে মৎস্যকন্যা মায়ের কথা। বউ কিন্তু এতে মোটেই অখুশি হোল না। সে শ্বশুরবাড়ি যাবে। তার মনে আনন্দ।

ছেলের শ্বশুর মেয়ের মুখ থেকে শুনলেন সমস্ত কথা। তাঁর মনে ভয়। কিন্তু মেয়ের মুখের আনন্দ তাঁর সমস্ত ভয়-ভাবনা ঘুচিয়ে দিল। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে। তার আয়োজনে তিনি মেতে উঠলেন। দিন স্থির হোল। মেয়ে তার শ্বশুরের জন্যে নিয়ে যাবে সদ্য ক্ষেত থেকে তোলা আক, কুমড়ো, আদা আর সব কত কি। সবুজ পাতায় সেগুলো মুড়ে রাখা হোল। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে।

এদিকে সর্পদেব অন্তর্যামী। তিনি ছেলের অন্তরের সংশয়ের কথা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরও মনে হোল, ঠিকই তো, বউমা বাড়ি এসে আমাকে দেখে কি ভাববে। মানুষের সংসারে আমি সাপ। বড়ই বেমানান। দেবতা হলেও তো আমি সাপ। মৎস্যকন্যা

আমার স্ত্রী। সে আমাকে জেনেই ঘরে এসেছে। ছেলেরা আমাদের সন্তান। কিন্তু বউমা।

সেই নির্ধারিত দিন এলো। আজ ছেলে বউ নিয়ে ঘরে আসবে। সারাদিন কি আনন্দ। মা পথ চেয়ে আছেন। ছোটভাই অপেক্ষা করছে। ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে গুহা। বিকেলবেলা ছেলে এল বউ নিয়ে। মা বউকে জড়িয়ে ধরে ঘরে গেলেন। ছোটভাই হাততালি দিয়ে নাচতে থাকল। কিন্তু একি। সর্পদেব কোথায়। খোঁজ খোঁজ। দু ছেলেই খুঁজল। প্রাণপণ। সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায়। কিন্তু না। তাঁকে আর কোথাও পাওয়া গেল না। যেন মন্ত্রবলে তিনি হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মানুষের সংসার থেকে, নিজে হাতে সংসার গড়ে দিয়ে।

লেপচা মেয়ে আর তার সংসার। অনেক ছেলেমেয়ে হোল তাদের। আজকের বাথুং-এর লোকেরা এদেরই বংশধর।

পাহাড়ী হরিণ বন্ধু পেল

ছোট এক পাহাড়ী উপত্যকায় থাকত এক হরিণ। তাকে নিয়েই এই গল্প।

শীতকালে সমস্ত উপত্যকাটা ঢেকে যায় বরফে। আর গ্রীষ্মে বরফ গলে গেলে মাটি দেখা যায়। তখন এখানে ঘাস আর ছোট ছোট পাহাড়ী গাছ জন্মাতে থাকে। বরফের শুভ্রতাকে ঢেকে তখন কোথাও কোথাও সবুজের আস্তরণ পড়ে। তখন কচি ঘাস-পাতায় জীবনধারণ করে হরিণটা। সারাদিন লাফিয়ে লাফিয়ে ডেকে ডেকে তার দিন কেটে যায়। নীলগাই, সম্বর, ঘুরাল তাকে সঙ্গ দেয়। ওরা ওর বন্ধু আর স্বজন। ওদের নিয়েই ওর দিন কাটে আনন্দে। দিনের পর দিন। আর এমনি করে সারাটা গ্রীষ্ম।

কিন্তু মুশকিল হোত তখন, যখন শীত আসত। উপত্যকার সমস্ত সমতলভূমি ছেয়ে যেত বরফে। তখন কোথাও ঘাস নেই। পাতা নেই। বরফ আর বরফ। হরিণের তখন কষ্টের কাল। তবু যতদিন অর্ধাহারে অনাহারে কাটানো যায়, সে এখানেই কাটাত। এ-উপত্যকা তার প্রিয়। ভীষণ, ভীষণ প্রিয়। এ তার নিজের ঘর। এখানে তার অনেক স্বজন। তবু একসময় তাকে এই ঘর, এই স্বজনদের ছেড়ে যেতে হোত। শীত যখন আরো কনকনে হয়ে নামত। যখন আর একটা ঘাসেরও মাথা দেখা যেত না। হরিণটা পাহাড়ী পথ ধরে তখন তিব্বতে চলে যেত। ওখানে তখন অনেক অনেক ঘাস পাতা মিলত। আর মিলত নুন। হরিণটা নুন খেতে খুবই ভালবাসত। তাই ঘরের যতই মায়া থাক, এখানটাও তার ভাল লাগত। তাই প্রত্যেক বছর শীতে সে তিব্বতেই যেত।

সে বছরও হরিণটা এক প্রবল শীতের দিনে তিব্বতের পথে রওনা

হয়েছিল। কোথাও পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই, কোথাও সমতল দিয়ে সে চলছিল। আর এই যাওয়ার পথেই কোথা থেকে ছুটে এল একটা বিরাট বাঘ। তার সামনে যাওয়ার পথ গেল আটকে। পেছনে ছুটতে গেলেও বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। হরিণটা ভয় পেল। আর তখনি হালুম হালুম শব্দ করে বাঘটা তাকে বলতে থাকল, কদিন ধরে আমার খাবারই জোটেনি। এখন তোকে দিয়েই পেট ভরাবো। হরিণ ভীষণ ভয়ে কাঁপছিল। তবু বাইরে তা কোনমতেই প্রকাশ হতে দিল না। বলল, আমাকে খাবে। হায় ভগবান। আমি কতদিন ভাল করে খেতে পাই না। শরীরে হাড় আর চামড়া ছাড়া তো কিছুই নেই। খাবেটা কি। বাঘ কিন্তু ওসব কোন কথা শুনতে চায় না। না থাক বেশি মাংস। ওই হাড় আর চামড়া চিবিয়েই সে খিদে মেটাবে। একেবারে কিছুই যখন মিলছে না, তখন এটাই বা মন্দ কিসে। বাঘ হরিণের দিকে থাবা বাড়াল। হরিণ তখন ভয়ে অর্ধমৃত। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। হরিণ গলায় সাহস আনল। ছ্যাখ, তার চেয়ে আমি বলি কি, কটা দিন অপেক্ষা কর। তাহলেই তুমি অনেক অনেক মাংস পাবে। তাজা আর নরম। বাঘের জিভ দিয়ে জল পড়ল। বলল, কি রকম। কি রকম। হরিণ বলল, দেখতেই পাচ্ছ, আমি এখন তিব্বতে যাচ্ছি। সেখানে অনেক খাবার-দাবার। অনেক নুন। এসব খেয়ে-দেয়ে সারা শীতকাল ধরে আমি খুবই নাদুস-নুদুস হব। আর সেই অনেক মাংসল হয়ে গ্রীষ্মের শুরুতেই আমি ফিরব। তখন যদি তুমি আমায় খাও, তাহলে তুমি কত বেশি মাংস খেতে পারবে। তাই না। বাঘ মহা চিন্তায় পড়ে গেল। তাইতো হরিণটা কথাটা ঠিকই বলেছে। কিন্তু যদি আর ও এপথে না ফেরে। অথবা একেবারেই আর না ফেরে। বাঘ তাকে তখনি বলল, তুমি যে এ-পথে ফিরবে তার নিশ্চয়তা কি। হরিণ ওকে ছুঁয়ে

প্রতিজ্ঞা করল। বাঘ এবার নিশ্চিন্ত। একবার হুঙ্কার দিয়ে সে বনের গভীরে অদৃশ্য হোল। হরিণ চলল আপন পথে তিব্বতের দিকে।

হরিণ সারাটা শীতকাল ধরে তিব্বতের বনে বনে চরে বেড়াল। ঘাস-পাতা আর নুন খেয়ে এখন তার শরীরটা তেল চুকচুকে। শরীরের ওজন বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। কিন্তু এখন শীত শেষ। ঘরের পথে ফিরতে হবে কদিনের মধ্যেই। আর ফেরার কথা ভাবতে গেলেই তার বুকের রক্ত জল হয়ে আসে। পথে অপেক্ষা করে থাকবে বাঘটা। এতদিনের এই অনেক যত্ন করে গড়ে তোলা শরীর আর মনের আনন্দে লাফিয়ে বেড়াবার দিনগুলো বাঘের এক এক থাবায় শেষ হয়ে যাবে ভাবতে গিয়ে হরিণের চোখে জল এল।

তারপর একদিন এল ফেরার সময়। হরিণের পা চলে না। মন ভয়ে অবশ। চোখের জল ঝরছে তো ঝরছেই। তবু হরিণ ঘরের পথে রওনা দিল। কিন্তু খানিকটা যেতেই তার পা অবশ হয়ে এল। সে পথের ধারেই বসে পড়ল। আর পথের ধারে বসেই সে কাঁদতে থাকল।

এদিকে তখন সেই পথেই আসছিল একটা ধাড়ী ব্যাঙ। তার আকার যেমন বিরাট, তার গলার স্বরও তেমন জোরালো। পথের ধারে অমন একটা জোয়ান হরিণকে কাঁদতে দেখেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, কিহে হরিণ ভায়া, অমন বাচ্চাদের মত কাঁদছ কেন। হঠাৎ কি তোমার বয়স কমে গেল। ব্যাঙের এ-কথা শুনে হরিণের কান্না আরো বেড়ে গেল। বলল, আজই তো আমার জীবনের শেষ দিন। তাই কান্না আর থামাতে পারছি না ভাই। ব্যাঙ খুবই অবাক হোল। সে কি ভাই, তুমি কি ভবিষ্যৎ জানতে পার নাকি। হরিণ কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিল, না ভাই, আজই আমাকে খাবার জন্যে একটা বাঘ পথে অপেক্ষা করে আছে। এরপরই হরিণ ব্যাঙকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল

সমস্ত কথা শুনে ব্যাঙ হরিণের পাশেই বসে পড়ল। তারপর আপন মনে ভাবতে থাকল কি করা যায়। কেমন করে বাঁচান যায় এই বেচারা হরিণকে।
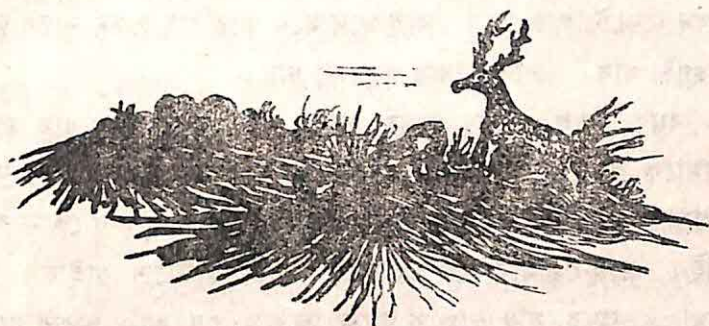
এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপরই ব্যাঙ উঠে দাঁড়াল। বলল, ঠিক আছে। তোমার কোন ভাবনা নেই। আমি তোমার পথ ধরেই বাঘের দিকে এগুচ্ছি। তুমি এখানে বসে থাক। আমি রওনা হবার এক ঘণ্টা পরে তুমি রওনা হবে। যেখানে বাঘটা দাঁড়িয়ে থাকবার কথা, সেখানেই আমাদের দুজনের দেখা হবে। বিরাট ব্যাং থপ্‌থপ্‌ করে ছুটে চলতে আরম্ভ করল। হরিণ বসে রইল ব্যাঙের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে।

এরপর একসময় চলার পথেই ব্যাং দেখল বাঘটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে। সে সোজা এগিয়ে গেল বাঘের সামনে। বলল, কি হে বাঘ মামা, এখানে অমন বোকা বোকা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন। কারো অপেক্ষায় নাকি। বাঘ মনে মনে বলল, ভাল বিপদ। কোথা থেকে এক ধেড়ে ব্যাঙ এসে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করল। মুখে বলল, হ্যাঁ ভাই ব্যাং। একটা হরিণের আসার কথা। ব্যাঙটা যেন একথা শুনে খুবই অবাক, এমন ভঙ্গি করল। তা হরিণ কি তোমার পোষা

নাকি, যে ঠিক এই সময়ে এই দিনে এখানে এসে দাঁড়াবে আর তুমি তাকে টপ্ করে খেয়ে নেবে। বাঘ বলল, না হে না। পোষা-টোষা কিছুই না। সে এই পথেই মোটাসোটা হবার জন্যে তিব্বতে গিয়েছে। আর আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে গেছে যে সে এপথেই ফিরবে আমার খাবার উপযুক্ত হয়ে। তা সে যাই হোক, তুমি বাপু এখন কেটে পড় তো। বাঘ মনে মনে ভাবছিল, অমন নাদুস-নুদুস হরিণটা খাব। এটা আবার ভাগ না চায়।

ব্যাঙ বুঝল বাঘের মনের ভাব। সে বলল, তা বাঘ মামা, আমাকে অমন করে তাড়াতে চাইছ কেন। আমি বাপু তো আর তোমার খাবারে ভাগ বসাতে যাচ্ছি না। এখন আমার কোন কাজ নেই। তাই তোমার সঙ্গে গল্প করে সময়টা কাটাতে চাইছি। তা মামা, তোমার যদি আপত্তি থাকে, তবে না হয়, আমি চলেই যাই। বাঘ খুবই বিব্রত বোধ করল। আসলে মাংসের ভাগ না চাইলে ব্যাঙ যতক্ষণ ইচ্ছে থাকুক না। আর থাকলে তো ভালই। হরিণটা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ সঙ্গীও হবে। বাঘ তাই মুখে বলল, না, না যেও না। তোমাকে তো আমি যেতে বলিনি। ব্যাঙও মনে মনে এটাই চাইছিল। সে এগিয়ে এসে আবার বাঘের কাছে দাঁড়াল।

তারপর বাঘ আর ব্যাঙ নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকল। আর এইরকম কথা বলতে বলতেই ব্যাঙ প্রস্তাব করে বসল, আর বাঘমামা, এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করার চেয়ে এসো না আমরা দুজনে দুজনের গায়ের এঁটুলি মেরে খাই। তাতে সময় কাটবে আর পেটেও কিছু পড়বে। বাঘ ভাবল, এ প্রস্তাবটা তো মন্দ না। বাঘ বলল, বেশ তো, তাহলে আমি আগে তোমার গায়েরটা মেরে খাই। তারপর তুমি আমার গায়ের এঁটুলি মেরে খেও। ব্যাঙ সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল। বাঘ ব্যাঙের গায়ের এঁটুলি খুঁজতে লেগে গেল। কিন্তু অনেকক্ষণ খুঁজে খুঁজেও বাঘ ব্যাঙের গা থেকেও

একটা এঁটুলি বের করতে পারল না। অবশেষে হতাশ হয়ে বাঘ বলল, না ভাই, আমার কপালটাই খারাপ। তোমার গায়ে তো একটা এঁটুলি পেলাম না। নাও এবার তুমি আমার গা দেখ।

ব্যাঙ একলাফে তার বড় শরীর নিয়ে বাঘের পিঠে চড়ে বসল। তারপর যেন তন্ন তন্ন করে এঁটুলি খুঁজছে, এমনভাবে লোম হাতড়াতে থাকল। আর এঁটুলির বদলে একটা একটা করে লোম ছিঁড়ে খেতে লাগল। বাঘ তখন মনে মনে ভাবছে, বাবা, আমার গায়ে কত এঁটুলি ছিল। ব্যাঙ ভায়া খেয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিল। আর ওদিকে ব্যাঙ প্রাণপণে বাঘের লোম খেয়ে চলেছে।

কিন্তু এত লোম খাওয়ার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাঙের বমি পেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ এক লাফে ঠিক বাঘের মুখের সামনে নেমে এল। আর নেমেই তার চোখের সামনে ওয়াক ওয়াক করে বমি করতে থাকল। বাঘ এতক্ষণ ব্যাঙের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। এবার অবাক হয়ে দেখল ব্যাঙের বমির সঙ্গে বেরিয়ে আসছে রাশি রাশি লোম। তাজ্জব কাণ্ড। বাঘ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তবে কি ব্যাঙটা এর আগে কোন বাঘ খেয়ে এসেছে। এখন আমাকে খাবার জন্যে আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। আর ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ চোঁচা দৌড়। ব্যাঙ চেঁচিয়ে ডাকল, ওকি বাঘমামা, পালাচ্ছ কেন। অনেক দূর থেকে বাঘের জবাব ভেসে এল, না পালালে, এতক্ষণ তো তুমি আমাকে খেয়েই ফেলতে। ব্যাঙ চোখের সামনে বাঘকে জঙ্গলের গভীরে মিলিয়ে যেতে দেখল।

ততক্ষণে হরিণটা এসে গেছে। বাঘকে জায়গায় না দেখে, ব্যাঙকে শুধোল বাঘের কথা। আর তখন ব্যাঙের মুখ থেকে সব কথা শুনে হরিণ আনন্দে ব্যাঙকে ঘিরে নাচতে থাকল।

সেই থেকে হরিণ আর সেই ধেড়ে ব্যাঙ বন্ধু হোল। তাদের এ বন্ধুত্ব কোনদিন চিড় খায় নি।

বানরের শত্রু চিতাবাঘ

ছোট্ট জলাটায় বর্ষাকালে কানায় কানায় জল ভরে থাকে। বেশি বৃষ্টি নামলে পাড় ছাপিয়ে জল উপছে পড়ে বনভূমির কিছু অংশে। দেওদার, পাইন, ওক গাছের শিকড়গুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে জল অল্প হাওয়ায় খেলা করতে থাকে। আর গ্রীষ্মের তাপে সারা বনাঞ্চল যখন শুকনো, ফুটিফাটা, তখন এ-জলায় জল থাকে না। কেবল একবুক জমাট কাদা। কোনক্রমে কোন জন্তু-জানোয়ার সে কাদায় পড়লে আর রক্ষে নেই। মৃত্যু অবধারিত। তাই সব জীবজন্তুই সে ডোবা এড়িয়ে চলে।

ঘন অরণ্যের মধ্যে এই যে জলা, এরই একধারে থাকত একটা বানর আর অন্যধারে এক সারস। বানর গাছের ফলমূল খায়। এ-গাছ সে-গাছ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। সারস জলায় মাছ ধরে। গ্রীষ্মেও তার খব অসুবিধে হয় না। জলার ধারে দুবেলাই বানর আর সারসের দেখা হয়। তারপর একদিন বানরই সারসকে ডেকে বলল, এসো আমরা দুজনে বন্ধুত্ব পাতাই। সারস বানরকে বিশেষ পাত্তা দিল না। বলল, তাতে কি লাভ। বানর অবাক হোল। লাভ। লাভ নেই কি বলছ। আমরা দুজন বন্ধু হলে একে অপরের বিপদে সাহায্য করতে পারব। একে অপরের সুখে আনন্দ পাব। সরস হাসল। তার কোন বন্ধুত্বে বিশেষ আগ্রহ নেই। সে একা থাকে। একাই তার জীবনধারণ। তাই বানরের সঙ্গে মিতালীতে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তবু বানরের নাছোড়বান্দা আগ্রহ দেখে সারস শেষ পর্যন্ত নিমরাজী হয়ে গেল। আর সেই থেকে বানর আর সারস বন্ধু। অন্তত বানর তাই ভাবে।

নিজেদের খাবার-দাবার যোগাড়ের সময় ছাড়া বাকি সমস্ত সময়

বানর সারসের কাছে কাছেই থাকে। সারস পছন্দ করে না। তবু বানর থাকে। এমন একদিনের কথা। বানরই প্রস্তাবটা তুলল। বলল, অনেকক্ষণ তো আমরা এমনি এমনি গাছের ডালে বসে আছি। বরং একটা কাজ করা যাক। বিরক্ত সারস বানরের মুখের দিকে চাইল। বানর বলে চলল, এসো আমরা দুজন গায়ে যত জোর আছে, তত জোরে ডাকি। দেখি কার গলায় কত জোর। সারস মনে মনে ভাবল, নেই কাজ তো খই ভাজ। খেয়ে-দেয়ে কি কাজ নেই। অকারণে চেঁচাতেই বা যাব কেন। মুখে বলল, বেশ তো তুমিই ডাক। বানর বলল, না, না। প্রস্তাবটা যখন আমি করছি, তখন তুমিই আগে ডাক। তর্ক করতে সারসের ভাল লাগল না। বলল, বেশ আমি ডাকছি। বলে, সাধারণভাবে যেমন করে ডাকে, সে-ভাবেই শব্দ করল। তাতে না হাওয়ায় কাঁপন জাগল, না কোন গাছের পাতা ঝরল। বানর এ-ডাক শুনে বলল, একি! তুমি কি এর চেয়ে জোরে ডাকতে পার না। তবে শোন আমার ডাক। বলেই সে এমন জোরে ডেকে উঠল যে বনের অনেক গাছ কেঁপে উঠল।

সারস মনে মনে ক্ষেপেই ছিল। একে তো বানর তাকে জোরে ডাকতে পারে না বলে অপমান করেছে। তার ওপর আবার বানরের সেই গাছ কাঁপানো ডাক। তাই এবার, শোন তবে আমার ডাক, বলে সারস তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এমন জোরে ডেকে উঠল যে, তারা যে গাছটায় বসেছিল, সেটা ভয়ঙ্করভাবে ঝড়ের ধাক্কার মত কেঁপে উঠল। আর সে ধাক্কায় বানরটা ছিটকে পড়ল সেই কাদা ভর্তি জলায়। পড়তেই বানর ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে জানত কেউ এখান থেকে টেনে না তুললে আর সে উঠতে পারবে না। সে চিৎকার করতে থাকল। কিন্তু সারস তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করল না। সে উড়ে চলে গেল। বানরের তখন প্রাণসংশয়। সে বন্ধু বন্ধু বলে চেঁচাতে থাকল। কিন্তু কোথায় বন্ধু। সে তখন বনান্তের অন্য গাছে উড়ে গেছে।

বানর তখন হতাশ হয়ে বনের পথের দিকে তাকিয়ে রইল। যদি কোন জানোয়ার এই পথে যায়, তবে সে তার সাহায্য চাইবে। কারণ এভাবে কতক্ষণই বা সে বাঁচতে পারবে। বানর পথের দিকে তাকিয়েই রইল।

হঠাৎ দেখল একটা হাতি সে পথে আসছে। বানরের মন আশায় নেচে উঠল। চিৎকার করে হাতিকে ডাকল। হাতিভাই, হাতিভাই, আমি এই জলার কাদায় আটকে গেছি। আমাকে টেনে তুলে বাঁচাও। তুমি না বাঁচালে আর কে আমাকে বাঁচাবে। বানরের এই করুণ আর্তনাদ হাতি কিন্তু কানেই তুলল না। সে যেন শুনতেই পায়নি, এমন করে অন্যদিকে তাকিয়ে নিজের পথেই চলে গেল। বানর তখনও করুণ গলায় হাতিকে তার আবেদন করে চলছিল।

কিছুক্ষণ পরে বানর সেই পথে একটা গণ্ডারকে আসতে দেখল। গণ্ডারটা জলার কাছাকাছি হতেই বানর আবার আর্তস্বরে তাকে ডাকতে থাকল, গণ্ডারভাই, গণ্ডারভাই, আমাকে বাঁচাও। তুমি আমাকে এখান থেকে না তুললে, আমাকে আর কে তুলবে বল। তারপর যদি তোমার ইচ্ছে করে তবে আমাকে না হয় খেয়ে ফেল। এখন অন্তত আমাকে এই কাদার মধ্যে ডুবে মরার হাত থেকে বাঁচাও। গণ্ডারও কিন্তু হাতির মতই, তার দিকে ফিরেও তাকাল না। চলে গেল নিজের পথে। নিজের কাজে। বানর আগের মতই আর্ত চিৎকারে গলা ফাটাতে থাকল।

এরপর সে-পথে এল ভাল্লুক। এল বুনো শুয়োর। এল আরো কত জীবজন্তু। কিন্তু কেউই বানরের আর্ত চিৎকার নিয়ে মাথা ঘামাল না। কেবল একটা বুনো ছাগল আসছিল সে পথে। সে একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর বানরের সব কথা শুনে বলল, বুঝতেই তো পারছ, আমি এইটুকু একটা ছাগল। কতটুকুই বা আমার গায়ের জোর, আর কিই বা আমার ক্ষমতা বল। মনে সাহস রাখ। অমন

ভেঙে পোড় না। অন্যের উপর ভরসা করলে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ডুবতে হয়। আর তাছাড়া আমার পরেও এপথ দিয়ে অনেক জানোয়ার যাবে। তারা নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবে। ভয় কি। বলতে বলতে বুনো ছাগল বনের মধ্যে অদৃশ্য হোল।

এর পরেই সে পথে এল এক বুড়ো বাঘ। বানর তাকে দেখে আবার সাহায্যের জন্যে কাতর আবেদন জানাল, কিন্তু তার এত তাড়া ছিল যে কোনদিকে না তাকিয়ে প্রায় ছুটে চলে গেল। বানরের গলা থেকে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

এবার আসছিল একটা চিতা বাঘ। বানর আর একবার আশায় বুক বাঁধল। বলল, চিতাভাই, আমি হঠাৎ এই কাদায় পড়ে ডুবে যাচ্ছি। এখান থেকে তুলে এভাবে মরার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। তারপর তুমি অনায়াসেই আমাকে খেতে পারবে। তাহলে তো তোমাকে আর কষ্ট করে আজ অন্তত আর কিছু ধরতে হবে না। চিতা কিন্তু তখনি তার এ-ডাকে সাড়া দিল না। চলতে চলতেই বলল, না, না, আমি শিকার ধরতে যাচ্ছি। এখন আমার সময় নেই। বানর কিন্তু চিতার কাছে তার করুণ মিনতি জানিয়েই চলল। চিতা বাঘ বানরের কথা গ্রাহ্য না করে যেমন যাচ্ছিল, তেমনি এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তার সংম্বিত ফিরল। ভাবল, তাইতো, বানর কথাটা তো খারাপ বলেনি। ওকে জলা থেকে তুলে আনলেই তো আজকের খাওয়ার সমস্যা মিটে যায়। আর আমারও ছুটোছুটি বাঁচে। চিতা ফিরে এল।

চিতার ফিরে আসা দেখে বানরের মন আনন্দে নেচে উঠল। আবার পরক্ষণেই সে ভয় পেল। আর তখনি চিতা তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, ছ্যাখ আমি তোমাকে জলা থেকে তুলছি, তোমাকে খাব বলে। তোলার পর পালাবার কোন চেষ্টা করবে না। তাহলে তোমাকে ছিঁড়ে ফেলতে আমার একমুহূর্ত সময় লাগবে না।

বানর, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, চিতাভায়া, মিথ্যে ভাবনা করছ। আমি কি কখনও পালাতে পারি। তাছাড়া তোমাকে যখন কথা দিয়েছি। চিতা জলার দিকে এগিয়ে গেল। থাবা বাড়িয়ে আস্তে আস্তে, তাকে টেনে ওপরে নিয়ে এল। বানর মাটি পেয়ে আবার উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু চিতা উপরে উঠেই বানরটাকে ধরতে যেতেই সে গোলমাল পাকাল। বলল, চিতাভাই, আমাকে এমনি এমনি কাঁচা তো আর তুমি খেতে পারবে না। তার চেয়ে তুমি কাঠকুটো এনে আগুন জ্বালাও। আমাকে সে-তাপে ভাল করে সেদ্ধ কর। তারপর তো খাবে। আর আগে আমার এই ভিজে শরীরটাকে শুকোবার জন্যে ওই বাঁশ ঝাড়ের কাছে পাথরের ওপরে রোদে দাও।

বোকা চিতা এসব কথাকে সত্যি ভেবে বানরটাকে ধরে সত্যিই রোদে শুকোতে দিল। তারপর চারিদিক থেকে শুকনো কাঠকুটো জোগাড় করতে থাকল আগুন জ্বালাবে বলে। তার ব্যস্ততা তখন অপরিসীম। কিন্তু বানরের ওপর সে ঠিক লক্ষ্য রেখেছে।

এদিকে পাথরের ওপর শুয়ে শুয়ে বানর ভাবতে থাকল কখন চিতাটা একটু অন্যমনস্ক হয়। আর তেমন একটা সুযোগ পেতেই সে চিৎকার করে বাঁশগাছকে বলল, বাঁশভাই, বাঁশভাই শীগ্‌গীরই তোমার একটা মাথা আমার দিকে নুইয়ে দাও। তোমাকে ধরেই আমি উঠে যাব। তা না হলে চিতাটা আমায় খাবে। বাঁশ কিন্তু বানরের কথা শুনতে পেল না। আর তখন চিতা হেঁকে বলল, কি হে চেঁচাচ্ছে কেন। বানর জবাব দিল, না, বলছিলাম, তোমার আগুন জ্বালাতে আর কত দেরি। চিতা ততক্ষণে কাঠ সাজিয়ে ফেলেছে। এবার আগুন জ্বালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সেটা দেখে, বানর আবার চেঁচিয়ে উঠল, বাঁশভাই, বাঁশভাই, মাথাটা নামাও। আর দেরি করল যে আমার জীবন যাবে। এবারেও বাঁশ কিন্তু শুনতে পেল না। আবার চিতা হেঁকে জিজ্ঞেস করল, কি বললে, জোরে

বল। বানর বলল, বলছিলাম যে, আমার একধারটা শুকিয়ে গেছে। এবার আমাকে উল্টিয়ে দাও। তা না হলে আমার অন্য ধারটা শুকোবে কি করে। চিতা এগিয়ে এল। বানরকে উল্টে দিল। আবার ফিরে গেল আগুন ধরাতে।

আর সেই ফাঁকে বানর আবার চেঁচিয়ে উঠল, বাঁশভাই, বাঁশভাই, আর দেরি কোর না। মাথা নামাও। আমার যে প্রাণ যায়। চিতা আবার চেঁচিয়ে উঠল, কি বলছ আবার। জোরে বল। শুনতে পাচ্ছি না।
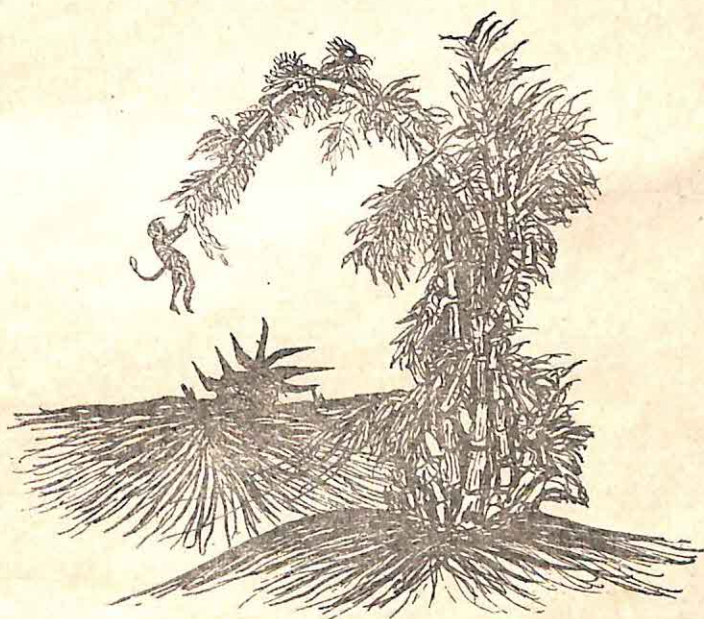
কিন্তু এবারে বাঁশ বানরের কথা শুনতে পেয়েছিল। সে মাথা নোয়াতেই বানর একলাফে বাঁশ গাছের মাথা ধরে ফেলল। আর তা দেখে বানরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে চিতা প্রাণপণে লাফ

দিল। কিন্তু ততক্ষণে বাঁশ আবার মাথা উঁচু করে সোজা দাঁড়িয়ে পড়েছে। চিতা এখন হতাশ হয়ে গজ্‌রাতে থাকল।

সেই থেকে চিতা আর বানরে শত্রুতা। আর সে শত্রুতা আজও চলেছে।